চেনা অচেনা

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

১

পৃথিবীর বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত জায়গায় এমন এমন সব অপ্রত্যাশিত বস্তু অবহেলায় পড়ে আছে যা পেয়ে গেলে আপনার জীবন, এমন কি পৃথিবীর চেহারাও পাল্টে যেতে পারে। ধরুন আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ বা ওরকম কিছু। আপনি কি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন? না করলেও ক্ষতি নেই। এরকম সব অদ্ভুত বস্তু থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

এই কাহিনীর নায়ক হিসেবে অনেক বেছেবুছে আমরা নচিকেতাকে নির্বাচিত করেছি। নচিকেতা মিত্র। নচিকেতাকে খুব গরিব, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত না ধনী কোন ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় তা নিয়েও আমরা কিছু ভাবনাচিন্তা করেছি। খুব গরিবদের গল্প ও জীবনচিত্র দেখাতে হলে তাকে একেবারে নাঙ্গা দরিদ্রের ঘরে জন্মাতে হয়। কারণ নায়ককে কেন্দ্র করেই যখন গল্প তখন তার পরিবার ও পরিবেশ প্রাধান্য পাবেই। কিন্তু গবেষণার পর আমরা তাকে খুব দরিদ্রের প্রতিনিধি করতে সাহস পাইনি। তার কারণ এই কাহিনীর উদ্দেশ্য এদেশের দারিদ্র্যবর্ণন নয়। তবে দরিদ্রদের কথা আসতে পারে, প্রসঙ্গক্রমেই, বাধা নেই।

নচিকেতা কেমন লোক? অবশ্যই যুবা। তার বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। তাকে আমরা খুব একটা স্বাস্থ্যবান বা হ্যাণ্ডসাম করিনি। সে বরং একটু রোগার দিকেই। লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি রাখলে কেমন হয়? এই হাইটটা আমার বেশ

পছন্দ। গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে সামান্য লম্বা, আবার বেঢপও নয়। হ্যাণ্ডসাম না হলেও তার চেহারায় একটু ধার যোগ করে দেওয়া যাক, মেধাবী ছাত্রদের যেমন থাকে। যদিও নচিকেতা মেধাবী কিনা তা আজ পর্যন্ত বোঝা যায়নি। প্রথাসিদ্ধ পড়াশুনো সে খুব বেশি করেনি। তবে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর সে কিছুদিন ডাক্তারী পড়েছিল। সে ডাক্তার হয় এই ইচ্ছেটা ছিল তার বাবার। নচিকেতার বাবা সুমথনাথের একটা নেশা ছিল, দেশভ্রমণ। বিশেষ করে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই এই নেশা তাঁকে ভূতের মতো পেয়ে বসে। বছরের মধ্যে দশ মাসই তিনি বাইরে ঘুরতেন। কয়েক বছর আগে লে যাওয়ার পথে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। খবরটি সামান্য অসমর্থিত, কারণ খাদ থেকে লাশ উদ্ধার করা যায়নি। আর লাশ পাওয়া না গেলে মৃত ব্যক্তিদের সাধারণতঃ নিরুদ্দেশ বলে ধরে নেওয়াই নিয়ম। নচিকেতার একজন দিদি আছে, এবং অবশ্যই একটি জামাইবাবুও। এই দিদি ও জামাইবাবু নচিকেতার প্রতি বিশেষ সদয় নন, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে নচিকেতার তেমন সম্পর্ক নেই। সংসারে একমাত্র সত্যিকারের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তার বাবার সঙ্গে। বাবার অসমর্থিত মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই সে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দেয়। তার বাবার সঞ্চিত কিছু অর্থ ছিল, তাই যথেষ্ট ছিল একটি জীবনযাপনের পক্ষে। নচিকেতা প্রথাসিদ্ধ পড়াশুনা ছেড়ে তার পছন্দমতো ব্যক্তিগত পড়াশুনো শুরু করে দিল। সেটা হলো রাজনীতি এবং দর্শন। আর একটি বিষয়েও তার প্রতিভা ছিল, তা হলো ভাষাতত্ত্ব।

নচিকেতার বংশ-পরিচয় খানিকটা দিয়ে রাখা ভাল। তার দাদু মন্মথনাথ এক দুরন্ত লাঠিয়াল ছিলেন। বাড়ির পাশে ছিল জিমন্যাসিয়াম। ছিল কেন, এখনও আছে। এই শারীরিক ব্যাপারটা নচিকেতাকে কোনোদিনই তেমন আকর্ষণ করেনি। তবে দাদুর পাল্লায় পড়ে তাকেও ছেলেবেলায় যথেষ্ট কসরৎ করতে হয়েছিল।

সুমথনাথ ছাড়াও মন্মথনাথের আরও কয়েকজন ছেলে ছিল। শেষ অবধি বেঁচে ছিলেন মোট দুজন। প্রমথনাথ ও সুমথনাথ। প্রমথনাথ তাঁর বাবার প্রিয়পাত্র ছিলেন না। লেখাপড়াতেও বেশিদূর এগোননি। তবে তিনি কোনও পারিবারিক বিবাদের কারণে গৃহত্যাগ করেন এবং মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে গিয়ে ডেরা বাঁধেন। প্রমথনাথের এর চেয়ে বেশি খবর আর কারও জানা নেই। মন্মথনাথের এক মেয়ে ছিল। ছিল কেন, এখনও আছে। তবে তাঁর বিয়ে হয়েছে রাঁচীতে। কালেভদ্রে আসতেন। ইদানীং তাও নয়।

মন্মথনাথের বাড়িটির অতএব দুই শরিক। কিন্তু প্রমথনাথ সম্পর্ক না রাখায় বাড়িটি নিষ্কণ্টক ভোগ করছিলেন সুমথনাথই। বেশ বড় বাড়ি। অনেক ঘর। জমিও বেশ খানিকটা। উত্তর কলকাতার একটি পুরোনো গলিতে হলেও সেখানে এখন জমির অনেক দাম। উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা নচিকেতাই পেয়েছে বটে, কিন্তু আপাতত সে গৃহহীন। নিরাশ্রয় না হলেও গৃহহীন।

যে-ঘটনার ফলে তাকে গৃহহীন হতে হয় সেটি ঘটেছিল মাত্র বছর দুয়েক আগে। সে সময়ে নচিকেতা পৈতৃক বাড়িতে একাই থাকত। তার অধিকাংশ সময়ের সঙ্গী ছিল বই আর গান। আড্ডাও সে দিত বটে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবরা সবাই দূরবর্তী জায়গায় থাকত বলে আড্ডাটা রোজ হতো না। আর বন্ধুও তার সামান্যই, তিন-চার জন মাত্র। নিজের পাড়ার লোকজন ও প্রতিবেশীদের আই কিউ এবং সংস্কৃতি এতই কম ছিল যে, সে কিছুতেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারত না। নিতান্ত অল্পবয়সেই সে দাম্ভিক অহংকারী প্রভৃতি বদনামে ভূষিত হয়েছিল। পাড়ার যুবসমাজকেও সে এড়িয়ে চলত, কারণ ঘটা করে দুর্গা বা কালীপূজা করা, মাঝে মধ্যে পয়সা হলে মদ্যপান করা, গ্যাঞ্জাম-পরনিন্দা- মেয়েছেলেকে লাইন দেওয়া ইত্যাদি নচিকেতার সহ্য হতো না। হিন্দি সিনেমা দেখা এবং সেসব ছবির গান প্র্যাকটিস করাও নচিকেতার অভিপ্রেত নয়। মাঝে

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

মাঝে ভাল নাটক দেখতে সে যেত বটে, আর শুনত উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্র সংগীত।

তবে এত সব কথা বলেও নচিকেতার সঠিক পরিচয় দেওয়া গেল বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ, মানুষের সত্য পরিচয় সবসময়ে তার জীবনযাপনের ধারা দেখে বোঝা যায় না। সংকটে আপৎকালে বা প্রয়োজনে তার ভিতরকার সুপ্ত মানুষটি হঠাৎ জেগে উঠতে পারে। তখন তার পরিচয়টাই পাল্টে যায়।

নচিকেতা নিজেও জানে না তার ভিতরে অন্য কোনও নচিকেতা আছে কিনা।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে তার বাবার অসমর্থিত মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার কিছুকাল পরেই। একদিন তার জামাইবাবু তেজেন ঘোষ একজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসে তাকে বললেন, নচিকেতা, এঁর সঙ্গে আলাপ কর। ইনি মস্ত বড় প্রোমোটার।

প্রোমোটার কথাটার মানে নচিকেতা ভাল বুঝল না এবং উটকো লোকের আগমনও বিশেষ পছন্দ করল না। আমাদের নায়কটির অমিশুক স্বভাবের খানিকটা আভাস ইতিমধ্যে বোধহয় দেওয়া গেছে। সে লোকটিকে কোনও অভিবাদন করল না, বসতে বলল না এবং আগমনের কারণও জিজ্ঞেস করল না, গোঁজ হয়ে রইল।

জামাইবাবু তেজেন ঘোষ বললেন, অনেক বলে কয়ে এঁকে রাজী করিয়েছি। বাড়িটা উনি নেবেন।

নচিকেতা অবাক হয়ে বলল, নেবেন মানে?

আরে ভাই, তোমার তো এত বড় বাড়ির কোনও দরকার নেই। শ্বশুরমশাইও চলে গেলেন, একা থাকার দরকার কী তোমার? তুমি আমার ওখানেই গিয়ে থাকতে পারবে। এটা বেচে নগদ কিছু টাকা পেয়ে গেলে আর তোমার ভাবনা কী? তার সুদেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

বাড়িটার যে একজন শরিক আছে তা নচিকেতা কোনও দিনই তোলেনি। উপরন্তু বাড়ি বিক্রি করার কথাটাও তার মাথায়

আসেনি। তাই সে বেশ স্পষ্টই বলে দিল, বাড়ি বিক্রি করার মালিক আমি নই। আমার জ্যাঠামশাই এ বাড়ির অর্ধেকের মালিক। আর আমি সাকসেশন সার্টিফিকেটও পাইনি যে বিক্রি করব।

তেজেনবাবু উকিল না হলেও আইনজ্ঞ মানুষ। খুব হেসে বললেন, আর ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। বাড়ির দলিলটা আমাদের সামনে ফেলে দাও, বাকিটা আমরা দেখব।

তেজেনবাবুর আনা আগন্তুকটি বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার। চোখে গভীর ধূর্তামি থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায়, সে যাই করুক না কেন নিম্নস্তরে করে না। অর্থাৎ চারশ বিশ হলেও অতি উচ্চমানের চারশ বিশ। এইসব লোককে দেখলে নচিকেতা দু কারণেই রেগে যায়। সে অভিজাতদের পছন্দ করে না, ধূর্তদেরও না।

যখন ঘটনাটি ঘটছে তখন আমাদের নায়কটি সদ্যযুবা, পিতৃশোকে দারুণ কাতর, অনিশ্চয়তায় আন্দোলিত, এবং স্নেহকাঙাল। সে এও জানত, এই বিশাল বাড়ি আঁকড়ে থাকার চেয়ে ছোটো কোনও ফ্ল্যাটে বা হস্টেলে গিয়ে থাকা ভাল। বাড়ি বিক্রির প্রস্তাবটিও খুব অন্যায় নয়। সে তার জামাইবাবুকে বলল, আপনি কী দেখবেন? জ্যাঠামশাইকে না জানিয়ে তাঁর অংশ বেচে দিতে চান?

আহা, তা কেন? আগে জ্যাঠামশাই দাবি করুন তবে তো ভাগ দেওয়ার প্রশ্ন। ইনি দুলাখ দিতে চাইছেন। তুমি চাইলে এক লাখ আলাদা রেখে দিও, জ্যাঠামশাই চাইলে দিয়ে দেবে। এ বাড়িতে তোমার দিদিরও অংশ আছে। আমি না হয় সেটা ছেড়ে দিচ্ছি।

গ্রন্থকীট নচিকেতা এ বাড়ির দাম দু'লাখ ন্যায্য কিনা সে লাইনে চিন্তা করল না। মন্মথনাথ ও সুমথনাথের কাছ থেকে সে উত্তরাধিকারসূত্রে একটি নীতিবোধ অর্জন করেছিল। সে ভাবল, এরা জ্যাঠাকে ঠকাতে চাইছে। সুতরাং ভারী রেগে গেল। বলল, বাড়ি বিক্রি হবে না। আমি একাই থাকব।

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

সম্ভ্রান্ত লোকটি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার ভারী থিয়েটারী ভরাট গলায় বলল, একা এত বড় বাড়ি নিয়ে থাকবে! সে কী? ইটস আ ক্রাইম। কলকাতায় স্থানাভাবে কত লোক বস্তিতে থাকে, ফুটপাতে শোয়। রাখতেও পারবে না। ট্যাক্স আছে, মেনটেনেন্স আছে।

সে আমি বুঝব।

তার বয়সের ছেলের পক্ষে এটা বেশ সাহসিকতারই কাজ হয়েছিল। জামাইবাবু ও প্রোমোটার বিদায় নিল বটে কিন্তু পরদিন দিদি এল ঝগড়া করতে। প্রথম নরম, তারপর গরম। নচিকেতা নিজেও জানত না যে সে এত ভাল ঝগড়া করতে পারে। দিদি হার মেনে চলে গেল।

আমাদের নায়কটির রাজনৈতিক ঝোঁকটি বরাবরই প্রবল। কিন্তু মেলামেশার অভাবে সে সক্রিয় রাজনীতি করতে পারত না। কী করে পারল সেটাও ঘটনারই ক্রম মাত্র।

দিদি ও জামাইবাবু এর পরও নানাভাবে তাকে নরম করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নচিকেতা ক্রমে জেদী থেকে জেদীতর হয়ে উঠেছে। তারপর একদিন একদল ছেলে ছোকরা এসে হাজির হলো, মশাই বাড়ি না ছাড়লে বহুৎ ঝামেলা হবে।

ছেলেগুলো পাড়ার রকবাজ, সিনেমাদেখা, আড্ডাবাজ ছেলে নয়। বেশ চোখা চালাক ডাকাবুকো ছেলে। পাড়ার ছেলে হয়ে থাকলেও এদের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ ঘটেনি তার।

নচিকেতা স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেস করল, এতে আপনাদের ইন্টারেস্ট কী?

আমাদের পারসোনাল ইন্টারেস্ট নেই, তবে পার্টি চাঁদা পাবে।

শুনে নচিকেতা মুগ্ধ হয়ে গেল। পার্টি চাঁদা পাবে বলে এরা তাকে উচ্ছেদ করতে চায়, এরকমটা সে আগে শোনেনি। বলাই বাহুল্য সে বুঝতে পেরেছিল যে তার জামাইবাবু এবং প্রোমোটার মিলে এই ছেলেগুলোকে পাঠিয়েছে।

তবু নচিকেতা তাদের বসাল এবং কথা বলতে লাগল।

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

না, সে বাড়ি বিষয়ে একটি কথাও কবুল করল না, সে বলতে লাগল এবং শুনতে লাগল রাজনীতি বিষয়ে।

রাজনৈতিক দর্শনে নচিকেতার জ্ঞান অনেক ব্যাপ্ত। পার্টির ছেলেদের এলেম তত নয়। কিন্তু তারা সক্রিয় রাজনীতি করে বলে পোক্ত বেশি।

ঘন্টা খানেক ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলার পর ছেলেগুলো তার বন্ধুর মতো হয়ে গেল। তাদের মতাদর্শের যে যথেষ্ট মিল তাও বেরিয়ে পড়ল কথায় কথায়।

উঠবার আগে ছেলেদের লীডার সুজিৎ বলল, বাড়িটা আপনি ছেড়েই দিন, পার্টি ফাণ্ডে ওরা বিশ হাজার টাকা দিচ্ছে।

নচিকেতা বলল, আমার টাকা আছে, আমি ওর চেয়ে বেশি দিতে পারি।

এটা তো নীলাম নয়।

আমিও বিড করছি না। আমি দলে ঢুকে কিছু করতে চাই। বাড়ি- টাড়ি নিয়ে আমার হেডেক নেই। পার্টি চাইলে ছেড়ে দিতে রাজী আছি।

ছেলেগুলো একথায় মুগ্ধ হয়ে গেল। সুজিৎ তার হাত ধরে বলল, আরে পার্টি তো আমাদের মায়ের মতো। ঠিক আছে, তোমার জন্য চেষ্টা করব।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনযাপনের একটা নিজস্ব সীমানা থাকে, তার বাইরে সে কদাচিৎ যায়। বলতে কি সীমানা-ডিঙানোর ঘটনাটি নচিকেতার ঘটে গেল আচমকাই।

কিছুদিনের মধ্যেই সে দলের হয়ে কাজ করতে লাগল।

রাজনীতি ব্যাপারটাকে আমরা এ ঘটনায় টেনে আনতে চাই না। এখানে রাজনীতির ভূমিকাও নেপথ্যের বলে আমার দলের নাম প্রকাশেও বিরত রইলাম।

তার দাদুর প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগারটির কথা এতক্ষণ কিছুই বলা হয়নি। মন্মথনাথ নিজের মায়ের স্মৃতিতে এই ব্যায়ামাগারটি

খোলেন। বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া জমিতে ব্যায়ামাগারটি একসময় ভালই চলত। এখন তেমন ছাত্র নেই। যন্ত্রপাতিও পুরোনো হয়েছে এবং আধুনিকীকরণ হয়নি। তবু যে কজন মানুষ ব্যায়ামাগারটিকে মন্দির বলে মনে করত পল্টু সেন তাদের অন্যতম। পল্টু সেন মন্মথনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য। এখন বয়স ষাটের ওপরে।

পল্টুই ব্যায়ামাগারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একসময়ে মন্মথনাথের এই বলবান শিষ্যটি ছিলেন পাড়ার ত্রাস। তবে দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে। পল্টু সেটা বোঝেন। আর বোঝেন বলেই এই চ্যাংড়াদের যুগে তিনি আর নিজেকে জাহির করেন না। শোনা যায় ব্যায়ামশিক্ষক হিসেবে তিনি খুবই মজবুত লোক।

পল্টুর সঙ্গে নচিকেতার যে খুব ভাব ভালোবাসা আছে তা নয়। তবে পল্টু নচিকেতাকে মন্মথনাথের নাতি হিসেবে দেখেন বলে স্নেহ করেন। প্রতি রবিবার নিয়মিত এসে তিনি নচিকেতাকে নিয়ে নিচের তলার ঘর খুলিয়ে মন্মথনাথের ঠিক বাইশটা পাকা বাঁশের লাঠি পরিষ্কার করেন। তেলটেল মাখান, গুরুর স্মৃতি মলিন হতে দেন না।

এইরকম একদিন লাঠির পরিচর্যা করতে এসে তিনি নচিকেতাকে বললেন, শুনছি নাকি বাড়িসমেত ব্যায়ামাগার তুমি বেচে দিচ্ছো!

না তো পল্টুকাকা। কেন?

শোনা যাচ্ছে খুব। তেজেন ঘোষ আর বিমান চৌধুরি যখন লেগেছে আটকাতে পারবে না।

আমি তো বেচবো না বলেই দিয়েছি।

পল্টু একথা কানে না তুলে বললেন, বাড়ি বাঁচাতেই কি রাজনীতি করতে লেগেছো? কাজটা ভাল করোনি। সুজিৎ কিন্তু খুনিয়া।

তার মানে?

ও অন্তত তিনটে লাশ নামিয়েছে। ওর হাতটাত কাঁপে না। ভয়ংকর ছেলে।

কখনও তো তা মনে হয় না।

এমনিতে বুঝবার উপায় নেই। তবে যা বলছি শুনে রেখো।

ও আমার বন্ধু। আমার কোন ভয় নেই।

ওসব ছেলের কোনও বন্ধু নেই। পার্টি বললে নিজের বাপকেও কেটে ফেলতে পারে।

নচিকেতা শুনল। কিন্তু কিছু বলার ছিল না তার।

পল্টু যাওয়ার আগে বললেন, ব্যায়ামাগারটা বেচো না। জানি বেচলে তুমি টাকা পেয়ে যাবে, কিন্তু ওটা তোমার দাদুর স্মৃতি।

স্মৃতি বলে নয়। এমনিতেই বেচব না। দেখবেন।

পল্টু কিছুক্ষণ দরজার কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে রইলেন চৌকাঠে। বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বললেন, সুজিৎ সম্পর্কে সাবধান, খুব সাবধান।

এই সাবধান-বাণী তখন অনাবশ্যক মনে হয়েছিল তার কাছে। কিন্তু নচিকেতা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তার সামনে ভর সন্ধ্যেবেলা একটা ঘটনা ঘটে গেল। বীভৎস ঘটনা। পার্টির কাজ সেরে সে সুজিৎ আর দলের আর কয়েকটা ছেলে ফিরছিল। পাড়ারই একটা গলিতে উল্টো দিক থেকে দুটো ছেলে আসছিল। গলির মধ্যে তেমন আলো ছিল না। নচিকেতা ছেলে দুটোর মুখ দেখতে পায়নি। কিন্তু তাদের দেখেই ছেলেদুটো থমকে দাঁড়াল।

মাত্র এই দৃশ্যটাই দেখতে পেয়েছিল নচিকেতা। আবছা অন্ধকারে দুটো ছেলে বিশ গজের মতো দূরত্বে হঠাৎ থমকে দাড়াল। অর্থাৎ এই দৃশ্যটা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তার মনে পড়ে। কিন্তু তারপর যা ঘটল সেটাই তার মাথার মধ্যে পাগলামির ঝড় তুলে দেয়।

তার ডান পাশে ছিল সুজিৎ। যে সুজিৎকে সে চোখা চালাক ধীমান বলে জানে, একটু ধারাল স্বভাব, কটকটে কথার সুজিৎ, যাকে তার বেশ পছন্দই হয় বন্ধু হিসেবে, সে হঠাৎ ''এই

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

শুয়োরের বাচ্চা'' বলে কেন অত বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল? আর সেই চেঁচানি এতই ভয়ংকর যে, শরীর হিম হয়ে যায়। পকেট থেকে কী একটা বের করে হাতে নিয়ে সুজিৎ ছেলে দুটোর দিকে দৌড়ে গেল।

ছেলেদুটোর একজন পিছন ফিরে ছুট দিল। অন্যজন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, সুজিৎদা, সুজিৎদা—

তারপরই গুলির শব্দ। পর পর তিন চারটে।

''পালা'' বলে চেঁচিয়ে সুজিৎ আর তার দলবল কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তা বুঝতেও পারল না নচিকেতা। একা গলির মধ্যে বারুদের কটু গন্ধ আর আবছা গলির মধ্যে পড়ে থাকা একটা লাশ নিয়ে সে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। ঘটনাটির অর্থই বুঝতে পারল না।

লোকজন যখন জড়ো হলো তখনও সে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় মূক। হাতে পায়ে জোর বল নেই। লোকে তাকে অদ্ভুত চোখে দেখছিল তাকিয়ে।

সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে সে নিজে বেরিয়ে আসতেই পারত না, যদি না দুটি শক্ত সবল হাত এসে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন করত এবং তারপর একরকম টেনে নিয়ে না যেত।

পল্টু তাকে টেনে নিয়ে নিজের বস্তির বাড়ির ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, তুই কি পাগল নাকি? এভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলি কেন?

নচিকেতা স্খলিত গলায় বলল, কী হলো পল্টু কাকা? এটা কী হলো?

তোকে তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, কথাটা কানে তুললি কই?

ধাতস্থ হতে অনেকটা সময় লাগল নচিকেতার। পল্টুর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে এসে তাকে হাঁ করে দেখতে লাগল। পল্টু তাকে এক গ্লাস জল খাওয়ালেন।

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

নচিকেতা জিজ্ঞেস করল, যে খুন হলো সে কে?

বোসপাড়ার ছেলে। সুজিতের কাছেই তালিম নিত। এক নম্বর শাগরেদ ছিল। ভিতরে ভিতরে কী হয়েছে কে জানে।

নাম জানেন?

জানব না কেন? এইটুকু বয়স থেকে চিনি। ওর নাম মন্টু। বাপ স্কুলমাস্টার, নীলমণি পাল।

নীলমণিবাবুর ছেলে! এঃ হেঃ।

পল্টু গম্ভীর হয়ে বললেন, নিজের পজিশনটা বুঝতে পারছিস তো!

কিসের পজিশন?

পুলিশ এলে কিন্তু সুজিৎ ধরা পড়বে না। স্পটে তাকে দেখা যায়নি। কিন্তু তোকে সবাই দেখেছে।

আমাকে ধরবে বলছেন?

ধরবে তো বটেই, ভীষণ হ্যারাসও করবে।

তাহলে কী করব?

আমি অ্যাবসকন্ড করতেই বলি।

ছেলেটাকে সুজিৎ মারল কেন জানেন?

পল্টু মাথা নেড়ে বলল, ততটা জানি না। তবে মন্টুর সঙ্গে সুজিতের বনিবনা হচ্ছিল না। মন্টু একটু পাওয়ার-হাংরিও ছিল। দলের মধ্যে ওরকম কত খুন-খারাপি হয়।

নচিকেতা ব্যাপারটা যত ভাবছিল ততই কেমন তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। শরীর থরথর করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে আসছে।

পল্টু বললেন, তোর আর এ পাড়ায় থাকা ঠিক হবে না।

কোথায় যাব?

তোর যে যাওয়ার জায়গা নেই সেটা আমি জানি। খুব তাড়াহুড়োয় ব্যবস্থা করাও যাবে না। আপাতত বউবাজারের ন্যাশনাল হোটেলে গিয়ে ওঠ। আমি কাল সকালেই যাচ্ছি তোর সঙ্গে দেখা করতে। একা যেতে পারবি, না ছেলেকে সঙ্গে দেবো?

ঘাড় নেড়ে নচিকেতা বলল, পারব।কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেন আমি পালাচ্ছি। খুন তো আমি করিনি। পুলিশ ধরলেও কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।

তুই করিসনি তো কে করেছে?

কেন, সুজিৎ?

সে কথাটা কোর্টে কবুল করবি?

করব না কেন?

করবি না এই কারণে যে, কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে সুজিৎ নিজে, নাহয় তার দলের ছেলেরা তোকে মেরে দেবে। শুধু পুলিশের ভয়ে তোকে পালাতে বলিনি।

সঙ্কটটা যে উভয়ত তা বুঝতে নচিকেতা একটু সময় নিল। এবং এই বিপদের মধ্যেও লক্ষ্য করল, পল্টুকাকা বরাবর 'তুমি' করে বলেন, কিন্তু আজ বলছেন 'তুই'। তুই তোকারিটা তুচ্ছার্থে নয়, সম্ভবত অতিরিক্ত স্নেহশীলতার বশেই।

পল্টু একটা চিরকুট লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, হোটেলের ম্যানেজার বিরাজকে এটা দিস, তাহলেই ঘর দেবে। পয়সাকড়ি সঙ্গে কিরকম আছে?

বিশেষ নেই। তবে আপাতত লাগবে না। কাল ব্যাঙ্ক থেকে তুললেই হবে।

পল্টু মাথা নেড়ে বললেন, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চেকবই কোথায় রেখেছিস?

দোতলায় আমার লোহার আলমারিতে। চাবি টেবিলের দেরাজে।

পল্টু হাত বাড়িয়ে বললেন, বাড়ির চাবি আমাকে দে। আর দেরি করিস না। যা। আয় আমি ট্যাক্সি ধরিয়ে দিচ্ছি।

বউবাজারের ন্যাশনাল হোটেলের একতলার একখানা এঁদো ঘরে সারা রাত নিদ্রাহীন ছটফটানিতে কাটাল নচিকেতা। তার মনে হচ্ছিল, তার জীবনের গতিপথে কে জোর করে একটা

দাঁড়ি টেনে দিতে চাইছে। তার নির্বিঘ্ন, স্বাধীন, একেশ্বর জীবনে এ ঝামেলা কেন এসে জুটল? একবার ভাবল, পল্টুকাকা যা বলেছেন তার সবটাই সত্য না হতে পারে। সুজিৎ তো তার বন্ধু। একবার সুজিতের কাছে গিয়ে হাজির হলে কেমন হয়? দলের তো অনেক ক্ষমতা, হয় তো দল তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। দল যদি তা করে তাহলে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সে সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভোরে উঠেই একবার সুজিতের কাছে যাবে।

ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই সে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ট্রাম ধরে সোজা সুজিতের ডেরায়। তার বিন্দুমাত্র ভয় করছিল না। সে ভাবছিল, পল্টুকাকা ভুল ভাবছেন, রাজনীতি করেননি তো কখনও।

সুজিতের বাড়ি কোথায় তা জানে নচিকেতা, কিন্তু সুজিৎ সেখানে কদাচিৎ রাত কাটায়। সে থাকে নচিকেতাদের চারটে গলির পর একটা ক্লাবঘরে। নামেই ক্লাবঘর এবং লাইব্রেরী। আসলে সেটা দলবলের ডেরা। ওপরে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি, এক ইঁটের পাকা দেয়াল। বারো ফুট বাই দশ ফুট হলেই ঢের। একখানা লম্বা টেবিল আছে। আর দু'খানা বেঞ্চ। পাঁচ সাত জনের রাত কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট।

ক্লাবঘরের দরজায় খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর জানালা খুলে কেউ তাকে একবার দেখে নিল। তারপরই দরজা খুলে গেল। ভিতরে সুজিৎ ছিল না। কিন্তু আর দু'জন ছিল, যাদের নচিকেতা মুখ চেনে।

কী চাও নচিকেতা?

সুজিৎকে চাই।

কেন?

তার সঙ্গে ভীষণ দরকার।

সে একটা জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে গেছে।

কোথায়?

বাংলাদেশি বই এর ঠিকানা
www.allbdbooks.com

আমাদের তো বলে যায়নি।

আমি একটু বিপদে পড়ে এসেছি।

জানি। তোমার উচিত পুলিশের কাছে সারেন্ডার করা।

কেন?

যদি সারেন্ডার করো তাহলে তোমার কেস পার্টি লড়ে দেবে।

নচিকেতা অবাক হয়ে বলল, আমি সারেন্ডার করব কেন? আমি তো কিছু করিনি।

তাহলে কে করেছে?

সুজিৎ করেছে।

ছেলেদুটো পরস্পরের দিকে চট করে একটু চোখ ঠেরে নিল।

ও কথাটা তোমার মুখ দিয়ে আর একবার বেরোলে কিন্তু বিপদ আছে।

কিন্তু ঘটনাটা তো আমার হাতে ঘটেনি। আমি ছেলেটাকে চিনতামও না।

একটা ছেলে গিয়ে ক্লাবঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

শোনো, তোমাকে আমরা কাল থেকে খুঁজছি। আমরা চাই মার্ডার চার্জটা তুমি নিজের ঘাড়ে নাও। ভয় নেই, পার্টি তোমার পেছনে আছে। তুমি চট করে রিলিজ হয়ে যাবে।

নচিকেতা এরকম আজগুবি প্রস্তাব জীবনে শোনেনি। সে হাঁ করে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে গেল। তারপর বলল, আমি! আমাকে তোমরা স্কেপগোট বানাতে চাইছো।

একজন যদি চার্জটা নেয় তাহলে পুলিশ বেশি ধরাপাকড় করবে না। নইলে একগাদা ছেলেকে তুলে নিয়ে যাবে।

নচিকেতা গিয়ে এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ফেলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ঠিক আছে। আমিও দেখে নেবো।

দুটো ছেলেরই বেশ মজবুত পোক্ত চেহারা। আর নচিকেতা জীবনে কখনও তেমন সিরিয়াস মারপিট করেনি। দরজা খুলে বাইরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে দুটো ছুটে এসে তাকে ধরল এবং টেনে আনল ক্লাবঘরের মধ্যে। দরজাটা আবার

বন্ধ করে দেওয়া হলো।

কী দেখে নেবে? পুলিশের কাছে সুজিতের নাম বলবে?

কেন বলব না?

বললে তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব তা জানো?

নচিকেতা গতকাল বিকেল থেকে টেনশনে আছে, রাতে ঘুম হয়নি। ফলে তার মাথা পাগল-পাগল ছিলই। এ কথায় আগুন জ্বলে গেল। কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে যাওয়াতেই সে দুম করে সামনে যে ছিল তার মুখে একখানা ঘুঁষি বসিয়ে দিল। এত জোরে মারল যে তার কব্জিতে মচাৎ করে একটা শব্দ হলো। আর ঝিনঝিন করে উঠল হাতটা।

ছেলেটা দমাস করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। দু'নম্বর ছেলেটা টপ করে কোথা থেকে যে একটা রড বের করে আনল কে জানে। চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়েও দ্রুত রডটা চালিয়ে দিল নচিকেতার মাথায়।

মারপিট না করলেও, স্বাভাবিক জৈব তাগিদেই নচিকেতা মাথাটা সরিয়ে নিয়ে খুলিটা বাঁচাল, কিন্তু রডটা পড়ল কাঁধের ওপর। এত জোরালো মার জীবনে খায়নি। শরীরটা যেন বেহাত হয়ে গেল হঠাৎ। মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। সে বসে পড়ল মেঝের।

ছেলেটা ফের রড তুলে ধেয়ে এল। নচিকেতা জৈব তাগিদেই বুঝতে পারল, দ্বিতীয় বার রড খেলে আর উপায় থাকবে না। ওই এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে দ্রুত নেমে আসা রডের মুখে তার মস্তিষ্কে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল তা কে জানে। তবে সে হাত মেলে দিল রডটার দিকে এবং যখন কালান্তক রডটা তার হাতের পাঞ্জা প্রায় থেঁতলে দিল তখন সেই হাতেই সে চেপে ধরল রডটাকে। তারপর একটা মরিয়া-ঝটকায় রডটাকে ছাড়িয়ে আনল প্রতিপক্ষের হাত থেকে।

তারপর সে রড তার হাতে হয়ে উঠল কালান্তক। ক'বার মেরেছিল ছেলেটাকে নচিকেতার মনে নেই। তবে রক্তাক্ত শরীরে

বাংলাদেশি বই এর আলয়
www.allbdbooks.com

ছেলেটা প্রাণহীনের মতো পড়ে ছিল মেঝেয়।

রডটা ফেলে দেওয়ার আগে সে তার আহত প্রতিদ্বন্দ্বীর জামা দিয়ে মুছে নিয়েছিল নিজের হাতের ছাপ। এসব বুদ্ধি কেউ তাকে জোগায়নি, আপনা থেকেই মাথায় এল।

ক্লাবঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে হোটেলে যখন ফিরে এল তখন পল্টু এসে গেছেন। উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছেন তার ঘরে। দেখেই চমকে উঠে বললেন, এ কী? মারধর খেয়েছিস নাকি?

নচিকেতা কষ্টে হেসে বলল, একটু হয়ে গেল।

কোথায় হলো? কোথায় গিয়েছিলি?

সুজিৎকে খুঁজতে। ক্লাবে।

পল্টু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে বললেন, সুজিৎকে খুঁজতে! তুই কি আহাম্মক?

আমি জানতে গিয়েছিলাম সুজিৎ আমার সত্যিকারের বন্ধু কিনা।

পল্টু হতাশভাবে ফোঁৎ করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, হুঁ! বন্ধু! কী হলো সেখানে?

দুটো ছেলে ছিল। তারা আমাকে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করতে বলছিল। খুনের চার্জ ঘাড়ে নিয়ে।

সুজিৎকে বাঁচাতে?

তাই বলছিল।

মারপিট হলো কেন?

আমি চলে আসছিলাম, ওরা জোর করে আটকাতে চেয়েছিল।

খুব জোর বেঁচে গেছিস, দেখছি। সহজে ছাড়া পাওয়ার কথা নয়।

হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচাতে আমিও উল্টে মেরেছি।

ভাল করেছিস। তোর বুড়ো আঙুলের মাথা কেটে গেছে। ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয় বাথরুমে গিয়ে।

ওতে কিছু হবে না। আপনি বলুন।

আজ তোকে এক জায়গায় যেতে হবে। লেক গার্ডেনসের কাছে। জায়গাটা খুব ভাল নয়।

ভাল নয় মানে?

আসলে একটা বস্তি। বস্তির মালিক আমার চেনা লোক।

নচিকেতার মুখ শুকোলো। বলল, বস্তিতে যে কখনও থাকিনি।

সে কি আর আমি জানি না? গোপালবাবুর বস্তির মধ্যেই একটু পাকা-বাড়ি আছে। খুব আরামের জায়গা নয়, কিন্তু নিরাপদ। চারদিকে চোখ রাখার লোক আছে।

আমার কি পাহারায় থাকা দরকার?

খুব দরকার। শুধু পুলিশ খুঁজলে কথা ছিল না। এখন তোকে সুজিতের দলও খুঁজবে। আজ যা কাণ্ড করে এসেছিস তার জল ও কতদূর গোড়ায় কে জানে। হোটেল ছেড়ে বেরোনোটা খুব আহাম্মকি হয়েছে।

নচিকেতা গুম হয়ে রইল।

পল্টু জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাঙ্কে তোর কত টাকা আছে?

দশ-বারো হাজার হবে।

এত কম কেন?

বাবার টাকাতে তো হাত দেওয়ার উপায় নেই। সাকসেশান সার্টিফিকেট পাইনি যে এখনও।

কী ভাবছেন পল্টুকাকা?

ভাবছি এ টাকায় তোর কতদিন চলবে।

যে ক'দিন চলে চলুক না। রোজগার করতে নেমে পড়ব।

দূর আহাম্মক! রোজগার করতে হলে ঘর থেকে বাইরে বেরোতে হবে। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বাইরে তোকে যত না দেখা যায় ততই ভাল।

নচিকেতা মাথা নেড়ে বলল, আমি এত লুকিয়ে থাকতে পারব না।

পারতে হবে।

বাংলাদেশি বই এর আড্ডার
www.allbdbooks.com

তাহলে আমার বই চাই। আমার বইগুলো বাড়ি থেকে এনে দেবেন?

দোবো। আমি টাকাপয়সার কথাটা ভাবছি। তোর চলবে কিসে?

ভেবে কি হবে?

তোকে ভাবতে হবে না, আমিই ভাববো। এখন ওঠ। তোর কিছু জামাকাপড় নিয়ে এসেছি বাড়ি খুলে।

নচিকেতাকে পল্টু যেখানে আনলেন সেটা বাস্তবিকই ভারী নোংরা জায়গা। আর দিনরাত্রি ঝগড়া চেঁচামেচি, মারপিঠ, মাতলামি, বউ-ঠ্যাঙানি।

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

২

বাবা সত্যপ্রকাশের সঙ্গে মা বরুণার যখন প্রায়ই ব্যক্তিত্বের সংঘাত লাগত—প্রায়ই লাগত সেটা—তখনই চান্দ্রেয়ীর বিষণ্ণতা রোগের শুরু। মা আর বাবার ঝগড়াকে ছেলেমেয়েরা কখনই সইতে পারে না। তাদের মা-বাবাময় শৈশবের সবচেয়ে বড় শাস্তিই বোধ হয় মা আর বাবার মধ্যে হিংস্র ঝগড়া। মা-বাবারা কখনও বুঝতে পারেন না, নিজেদের বেসামাল বিবাদের ফলে তাঁদের শিশুরা কিরকম ক্ষয় হয়ে যায় ভিতরে ভিতরে।

বাংলাদেশি বই এর ভান্ডার
www.allbdbooks.com

চান্দ্রেয়ীর শৈশব কেটেছে একটি সম্পন্ন পরিবেশে, কিন্তু এই নরকযন্ত্রণায়। তার প্রায় বারো-তেরো বছর বয়সে সত্যপ্রকাশ ও বরুণা আদালতে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলেন। চান্দ্রেয়ী কোন দিকে যাবে তা বিচারপতিও জানতে চেয়েছিলেন। চান্দ্রেয়ীর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আপনি কেন ডিভোর্স দিচ্ছেন জজসাহেব, আপনি ওদের আবার মিলিয়ে দিন।

আইনত চান্দ্রেয়ীর থাকার কথা বাবার হেফাজতে। মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ থাকবে। বাবা সত্যপ্রকাশের দিকে চান্দ্রেয়ীর ঝোঁক বরাবর বেশি। সে হলো বাবার নয়নের মণি। মায়ের কাছেও সে কিছু কম নয়। তবে মা একটু-আধটু শাসন শুরু করেছিলেন ইদানীং। আর বাবার

শুধু অগাধ অন্যায্য প্রশ্রয়।

মুস্কিল দেখা দিল ডিভোর্সের পর। সত্যপ্রকাশকে প্রায়ই চাকরিতে বাইরে যেতে হয়। দিল্লি, বোম্বাই তো বটেই, ইউরোপ আমেরিকাও। ফলে চান্দ্রেয়ীর পক্ষে বাড়িতে থাকা মুস্কিল।

সত্যপ্রকাশ একদিন তাকে কাছে ডেকে করুণ মুখে বললেন, কপালটাই আমার খারাপ রে। মামলার সময় তো কথাটা মাথায় খেলেনি যে, আমাকে ট্যুর করতে হয়। তখন জেদটাও বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল। তুই কি তোর মার কাছে গিয়েই থাকবি ?

মায়ের কাছে থাকতে পারত চান্দ্রেয়ী। কিন্তু সেখানে আর একটা প্রকাণ্ড অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। তার মা বরুণা—শোনা যাচ্ছে একজন যুবকের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছেন। বিয়ে না হলেও শীগগিরই হয়তো লিভিং টুগেদার শুরু হবে।

চান্দ্রেয়ী বাপের চেয়েও করুণতর মুখে বলল, আমাকে কোনোও হস্টেলে দিয়ে দাও বাবা।

চান্দ্রেয়ী দুভাগ হয়েছিল মা-বাবার ডিভোর্সেরও আগে থেকে। নিজের দ্বিধাবিভক্ত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ সে অল্প বয়সের মস্তিষ্কে ঠিক টের পেত না। কিন্তু মাথাটা পাগল-পাগল লাগত তখন থেকেই। হস্টেলের নির্বাসনে হয়তো মাথার ভূতটা খানিক জিরোবে, ভেবেছিল সে।

সত্যপ্রকাশ পাগলের মতো মেয়ের জন্য হস্টেল খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ভাল হস্টেলে জায়গা পাওয়া কঠিন। মেয়েদের হস্টেল এমনিতেই এত কম কলকাতায়। যাও বা আছে তার বেশির ভাগই সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড। চান্দ্রেয়ী বড় আদরের মেয়ে তাঁর, সে কষ্ট পেলে তো চলবে না সত্যপ্রকাশের।

সত্যপ্রকাশের একটি পৈতৃক বাড়ি ও যৌথ পরিবারও আছে। যদিও সেই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি তেমন। মা এখনও বেঁচে। আরও দুই ভাইও একসঙ্গে বেলঘরিয়ার পৈতৃক বাড়িতে বাস করে। হস্টেলের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ সত্যপ্রকাশ একদিন বেলঘরিয়া ঘুরে এসে মেয়েকে বললেন, তুই তোর ঠাকুমার

কাছে কাকাদের সঙ্গে থাকতে পারবি ?

তাদের তো প্রায় চিনি না।

সে আমার দোষ। তোর মায়েরও। সে শ্বশুড়বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না, তোকেও যেতে দিত না। আমি মাঝে মাঝে একা গিয়ে মাকে দেখে আসতুম।

চান্দ্রেয়ী বলল, ঠাকুমাকে আমি মোটে তিন-চারবার দেখেছি।

ওরা লোক ভাল। তোকে মাথায় করে রাখবে।

তুমিও কি ওবাড়িতে যাবে ? তুমি গেলে আমি যেতে রাজী।

সত্যপ্রকাশ একটু ভাবনায় পড়লেন, কি জানিস, আমার থাকার পক্ষে বিশেষ সুবিধে নেই। আমার ভাগে পড়েছে মোটে একখানা ঘর। যেখানে তুই জিনিসপত্র নিয়ে থাকতে পারবি। কিন্তু এই ফ্ল্যাটের যাবতীয় জিনিস তো আঁটবে না সেখানে। ঘরটাও ছোটো।

চান্দ্রেয়ী খুব স্বাধীনচেতা কখনও ছিল না। বরং একটু নরম, ভীতু স্বভাবেরই মেয়ে সে। বাবা যা যাইছে তাতে রাজী হওয়াটাই তার যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। একদিন বাক্স, বিছানা সমেত তাকে বেলঘরিয়ার বাড়িতে রেখে এলেন সত্যপ্রকাশ।

এক অচেনা জগতে এসে পড়ল চান্দ্রেয়ী। ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ির মধ্যে অনেক লোক। দুই কাকা, কাকীমা, ছেলেমেয়ে। আর ঠাকুমা। আসলে গুনে দেখলে লোক মোটেই বেশি নয়। দুই কাকার মোট ছেলেমেয়ের সংখ্যা মাত্র তিন। কিন্তু চান্দ্রেয়ী তো এই মানুষের মধ্যে বড় হয়নি। সে ছিল মা-বাবার একা একেশ্বরী সন্তান। নিঃঝুম ছিল তাদের ফ্ল্যাটে।

মুস্কিল ও অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। সে কারোও সঙ্গেই ভাল মিশতে পারে না বলে ভারী জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হয় এখানে। তাকে নিয়ে সকলেরই কৌতূহল বড্ড বেশি। ঠারেঠোরে তার মা-বাবার গণ্ডগোলের কথাও জানতে চায় কাকীমারা। তিনটি ছেলেমেয়েই তার চেয়ে বয়সে ছোট। তবে তাকে নিয়ে তারা যে আড়ালে একটু হাসাহাসি করে তা টের

পায় চান্দ্রেয়ী। ঠাকুমা একটু খিটখিটে এবং বদরাগী। চান্দ্রেয়ী বাড়িতে পা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুমা এ বাড়ির কয়েকটি নিয়ম ভারী চাঁছছোলা ভাষায় জানিয়ে দিলেন। যেমন, পায়খানার কাপড় ছেড়ে ফেলতে হবে, বাসি কাপড়ে থাকা চলবে না, ছেলে-বন্ধু থাকা বারণ ইত্যাদি। চান্দ্রেয়ী বুঝল, এ বাড়ির কারও সঙ্গেই তার তেমন বনিবনা হবে না।

তবে চান্দ্রেয়ী শান্ত সুশীলা মেয়ে। সে চুপচাপ একা কাটিয়ে দিতে পারে। তাই শত অসুবিধে হলেও সে গুটিপোকার মতো থাকতে পারবে।

লোয়ার সার্কুলার রোডে ইস্কুলে যেতেও বেশ কষ্ট হতো। ভীড়ের ট্রেনে উঠে রোজ যাওয়া এবং ফেরা তার অভ্যাস ছিল না তো। শেয়ালদায় নেমে আবার বাসে চেপে খানিকটা যেতে হয়।

বাবা সত্যপ্রকাশ মাঝে মাঝেই বাড়ি আসতেন মেয়েকে দেখতে। মাঝে মাঝে কলকাতার বাড়িতেও সে যেতে লাগল।

বেলঘরিয়ায় যাওয়ার পর প্রথম যেদিন মায়ের সঙ্গে দেখা হলো সেদিন বরুণা রাগে ফেটে পড়লেন, এই সর্বনাশই যদি করবে তোর বাবা তাহলে কাস্টডি তো আমাকেই দিতে পারত।

চান্দ্রেয়ী ভারী নরম গলায় বলল, সর্বনাশ কেন ভাবছো মা? আমি তো বেশ আছি।

ছাই আছিস। ও বাড়ির সব্বাইকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ওরা কি মানুষ নাকি?

ওরকম বলো না মা। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বরুণা খুব সেজেগুজে ছুকরি সেজেছেন, সেটাও লক্ষ্য করল চান্দ্রেয়ী। এই মায়ের সঙ্গে তার বনিবনা হওয়ার নয়। এ মা সে মা নয়। তাই সে বেলঘরিয়ার বাসার আশ্রয়টিকে অনেক বেশি নিরাপদ মনে করতে লাগল।

সত্যপ্রকাশ অর্থাৎ তার বাবা সম্পর্কে এক ধরনের গভীর

দুর্বলতা ছিল চান্দ্রেয়ীর। বাবারা যে ভারী ছেলেমানুষ, একথা মেয়েদের মনে হবেই। কিন্তু চান্দ্রেয়ীকে দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাতটি সহ্য করতে হলো বাবার কাছ থেকেই।

প্রথম শুনল বড় কাকীমার কাছ থেকে। তারপর কাকাদের আলোচনা থেকেও। সত্যপ্রকাশ বাইশ বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছেন।

খিটখিটে রাগী ঠাকুমা ঠিক এই পরিস্থিতিতেই চান্দ্রেয়ীকে বুকে তুলে নিলেন। যখন সে এক গভীর রাতে একতলার একটেরে ঘরটিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে বড় অভিমানে কাঁদছিল, তখনই দরজায় ধাক্কা পড়ল।

চাঁদি দরজাটা খোল ভাই।

চান্দ্রেয়ী দরজা খুলতেই ঠাকুমা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোকে আমি অন্যরকম করে মানুষ করব। এইসব পচা মানুষগুলোকে ভুলে যা। চান্দ্রেয়ীর তো আর কোল নেই। সে ঠাকুমাকে আঁকড়ে ধরল।

ঠাকুমা তাকে নিয়ে এক বিছানায় শুয়ে রইল রাতে। কত কাঁদল। বলল, এ কী হলো বল তো! এরকম করে তোকে ছেঁটে ফেলে দিল ওরা? এরা কি মা-বাবার জাত?

ঠাকুমাকে, বলতে কি, এই প্রথম কাছে পেল চান্দ্রেয়ী। এবং ঠিক এভাবে এত আদর করে তাকে কাছে টানবার আর যে কেউ আছে পৃথিবীতে তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না।

চান্দ্রেয়ী কি মাঝে মাঝে মরার কথাও ভাবত না? খুব ভাবত, সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে বা ট্রেন লাইনে গলা দিয়ে, নইলে শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে।

কিন্তু আবার ভাবত, মরাটা তো হাতেই রইল, যখন তখন মরা যাবে। মরতে সে একটুও ভয় পায় না, অবশ্য কোনও মেয়েই পায় না। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মৃত্যুভয় অনেক কম। মরা তো হাতেই রইল, চান্দ্রেয়ী বেঁচে থাকাটাকে আর একটু দেখে নিতে চায়।

সত্যপ্রকাশের বিয়ের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি মাসখানেকের মতো ডুব মারলেন। ওদিকে বরুণাও,শোনা গেল,কাশ্মীর বেড়াতে গেছেন। সঙ্গে সেই প্রেমিক ছোকরা।

বেলঘরিয়ার বাড়িতে ম্লান থেকে ম্লানতর একাকীত্বের মধ্যে গুটিপোকার মতো চান্দ্রেয়ী বেঁচে আছে। জীবনে সে কখনও তেমন কাজটাজ করেনি। তার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না কোন দিনই। অ্যালার্জি, রক্তাল্পতা, মাথা ধরা এসব ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু বেলঘরিয়ায় এসে তাকে নিজের জামাকাপড় কাচতে হয়, জুতো সাফ করতে হয়, নিজের সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হয়। কিছুদিন থাকার পর সে বুঝতে পারছিল বেলঘরিয়ার বাড়ির লোকগুলো খুব খারাপ নয়। ঝগড়াটগরা হয়, চেঁচামেচি হয়, স্বার্থপরতাও আছে, তবু তার সুন্দর স্বভাব এবং চুপচাপ থাকার গুণে চান্দ্রেয়ীর প্রতি সকলেই কিছু সদয় ও কোমল। তিনটে ভাইবোনের সঙ্গে তার মোটামুটি ভাব হলো। একটা জিনিস অবশ্য তার খারাপ লাগে, তবু মুখ বুজে সইতে হয়। সেটা হলো এদের মুখে যখন-তখন সত্যপ্রকাশ আর বরুণার নিন্দে।

সত্যপ্রকাশ মাসখানেক বাদে যখন এলেন তখন তাঁর বিয়ের খবরটা আর গুজবের স্তরে নেই, বাস্তবায়িত হতে চলেছে। কথাটা তিনি কবুলও করলেন, বিয়ে না করলে চলছিল না। বিয়ের পর চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে যাবো।

এ কথায় রুখে উঠলেন ঠাকুমা, নিয়ে যাবি মানে? তোর কথায় সব হবে নাকি? কাকে না কাকে এনে ঘরে তুলছিস, সে কেমন মেয়েমানুষ তা জানি না, হুট করে তার হেফাজতে ওই ঠাণ্ডা বোকা মেয়েটাকে নিয়ে ফেললেই হলো! সৎমা বলে কথা।

তাহলে ও কোথায় থাকবে?

কেন, এখানে যখন এনেছিলি তখন তো ফেরৎ নেওয়ার

কথা বলিসনি। বিয়ে করছিস কর, একটা ছেড়ে দশটা কর, এই কচি মেয়েটার আর সর্বনাশ করিস না। ওর মনের দিকে তোরা তো চাইলি না। ভাবলি গুচ্ছের খাওয়ালে আর জিনিস কিনে দিলেই বুঝি আদরের চূড়ান্ত হলো। ওর জন্য কী ছেড়েছিস তোরা দুজন? কী ত্যাগ করলি? ছেলেমেয়ের জন্য বাপ-মার কতখানি করতে হয় তা জানিস?

সত্যপ্রকাশ অধোবদন। পরে মেয়ের কাছে এসে ভারী লাজুক আর অপরাধী ভঙ্গিতে বললেন, তোকে এরা ছাড়তে চাইছে না। আমি তোর মতটা জানতে চাই।

চান্দ্রেয়ীর মনটা যে কত শক্ত হয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে তা সে নিজেও জানত না। সে ভারী শান্তি গলায়, আমি এখানে বেশ আছি, বাবা।

আমার কাছে যেতে তোর ইচ্ছে করে না?

চান্দ্রেয়ী ভারী অনুকম্পার চোখে তার বাবাকে দেখল। সত্য বটে, একসময়ে বাবাকে কাছে পেলেই তার আনন্দ হতো। বাবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। এখন যেন সেই আনন্দ আর প্রত্যাশাটা নেই।

সে মৃদুস্বরে বলল, তোমার কাছে? শুধু তোমার কাছে তো যেতেই চাইতুম। কিন্তু...

এই কিন্তুর অর্থ সত্যপ্রকাশ ধরতে পারলেন। মাথা নেড়ে বললেন, তোকেই সব কিছুর ভোগ একা সইতে হলো।

সত্যপ্রকাশ সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আরও বছর খানেকের মধ্যেই চান্দ্রেয়ীর মা আর বাবা পৃথকভাবে অন্য দুজন পুরুষ ও নারীর সঙ্গে স্বামী স্ত্রী হয়ে জোড় বাঁধলেন। চান্দ্রেয়ী যখন ভাবে তখনই অবাক হয়, তার মা আর একজনের বউ, তার বাবা আর একজনের স্বামী। বাঃ, অদ্ভুত তো। তার বাবার বউ তার বাবার চেয়ে বয়সে

সত্যপ্রকাশের বিয়ের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি মাসখানেকের মতো ডুব মারলেন। ওদিকে বরুণাও,শোনা গেল,কাশ্মীর বেড়াতে গেছেন। সঙ্গে সেই প্রেমিক ছোকরা।

বেলঘরিয়ার বাড়িতে ম্লান থেকে ম্লানতর একাকীত্বের মধ্যে গুটিপোকার মতো চান্দ্রেয়ী বেঁচে আছে। জীবনে সে কখনও তেমন কাজটাজ করেনি। তার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না কোন দিনই। অ্যালার্জি, রক্তাল্পতা, মাথা ধরা এসব ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু বেলঘরিয়ায় এসে তাকে নিজের জামাকাপড় কাচতে হয়, জুতো সাফ করতে হয়, নিজের সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হয়। কিছুদিন থাকার পর সে বুঝতে পারছিল বেলঘরিয়ার বাড়ির লোকগুলো খুব খারাপ নয়। ঝগড়াটগরা হয়, চেঁচামেচি হয়, স্বার্থপরতাও আছে, তবু তার সুন্দর স্বভাব এবং চুপচাপ থাকার গুণে চান্দ্রেয়ীর প্রতি সকলেই কিছু সদয় ও কোমল। তিনটে ভাইবোনের সঙ্গে তার মোটামুটি ভাব হলো। একটা জিনিস অবশ্য তার খারাপ লাগে, তবু মুখ বুজে সইতে হয়। সেটা হলো এদের মুখে যখন-তখন সত্যপ্রকাশ আর বরুণার নিন্দে।

সত্যপ্রকাশ মাসখানেক বাদে যখন এলেন তখন তাঁর বিয়ের খবরটা আর গুজবের স্তরে নেই, বাস্তবায়িত হতে চলেছে। কথাটা তিনি কবুলও করলেন, বিয়ে না করলে চলছিল না। বিয়ের পর চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে যাবো।

এ কথায় রুখে উঠলেন ঠাকুমা, নিয়ে যাবি মানে? তোর কথায় সব হবে নাকি? কাকে না কাকে এনে ঘরে তুলছিস, সে কেমন মেয়েমানুষ তা জানি না, হুট করে তার হেফাজতে ওই ঠাণ্ডা বোকা মেয়েটাকে নিয়ে ফেললেই হলো! সংমা বলে কথা।

তাহলে ও কোথায় থাকবে?

কেন, এখানে যখন এনেছিলি তখন তো ফেরৎ নেওয়ার

কথা বলিসনি। বিয়ে করছিস কর, একটা ছেড়ে দশটা কর, এই কচি মেয়েটার আর সর্বনাশ করিস না। ওর মনের দিকে তোরা তো চাইলি না। ভাবলি গুচ্ছের খাওয়ালে আর জিনিস কিনে দিলেই বুঝি আদরের চূড়ান্ত হলো। ওর জন্য কী ছেড়েছিস তোরা দুজন? কী ত্যাগ করলি? ছেলেমেয়ের জন্য বাপ-মার কতখানি করতে হয় তা জানিস?

সত্যপ্রকাশ অধোবদন। পরে মেয়ের কাছে এসে ভারী লাজুক আর অপরাধী ভঙ্গিতে বললেন, তোকে এরা ছাড়তে চাইছে না। আমি তোর মতটা জানতে চাই।

চান্দ্রেয়ীর মনটা যে কত শক্ত হয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে তা সে নিজেও জানত না। সে ভারী শান্ত গলায়, আমি এখানে বেশ আছি, বাবা।

আমার কাছে যেতে তোর ইচ্ছে করে না?

চান্দ্রেয়ী ভারী অনুকম্পার চোখে তার বাবাকে দেখল। সত্য বটে, একসময়ে বাবাকে কাছে পেলেই তার আনন্দ হতো। বাবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। এখন যেন সেই আনন্দ আর প্রত্যাশাটা নেই।

সে মৃদুস্বরে বলল, তোমার কাছে? শুধু তোমার কাছে তো যেতেই চাইতুম। কিন্তু...

এই কিন্তুর অর্থ সত্যপ্রকাশ ধরতে পারলেন। মাথা নেড়ে বললেন, তোকেই সব কিছুর ভোগ একা সইতে হলো।

সত্যপ্রকাশ সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আরও বছর খানেকের মধ্যেই চান্দ্রেয়ীর মা আর বাবা পৃথকভাবে অন্য দুজন পুরুষ ও নারীর সঙ্গে স্বামী স্ত্রী হয়ে জোড় বাঁধলেন। চান্দ্রেয়ী যখন ভাবে তখনই অবাক হয়, তার মা আর একজনের বউ, তার বাবা আর একজনের স্বামী। বাঃ, অদ্ভুত তো। তার বাবার বউ তার বাবার চেয়ে বয়সে

অনেক ছোটো, তার মায়ের স্বামীও তাই।

মা-বাবার অবশ্য তাকে নিয়ে আদিখ্যেতার অন্ত ছিল না। প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা বাবা একটা না একটা কিছু উপহার নিয়ে আসেন। খাবারের প্যাকেটও। ছলছল চোখ করে অনেক গাঢ় কথা বলেন। ভাবের কথা। মাসের একটা বা দুটো রবিবার চান্দ্রেয়ীকে নিয়ম করে যেতে হয় মায়ের কাছে। মা ও ছলোছলো চোখে চেয়ে থাকে, আদরটাদর করে, নিজের দামী শাড়ি বা সেন্ট দিয়ে দেয়।

এ সবই সত্যি। কিন্তু চান্দ্রেয়ী আর কিছুতেই এই দুজনকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। এদের চোখের জল, আদর, উপহার সবই সে কাঠের পুতুলের মতো গ্রহণ করে। তার না আসে কান্না, না আনন্দ।

সে শুধু পাখির মতো নরম গলায় বলে, আমি ভাল আছি। তোমরা আমার জন্য ভেবো না।

ভালই আছে চান্দ্রেয়ী। তার নিজের গুটির মধ্যে। নিজের অবরোধের ভিতরে গুটিয়ে গিয়ে, শক্ত হয়ে, অনুভূতির ভাবাবেগের সব রন্ধ্র বন্ধ করে এ একরকম ভালই থাকা। খাওয়া-পরার কষ্ট নেই বটে, কিন্তু থাকলেও কষ্টটা টের পেত না সে, গায়ে মাখত না। কেউ অপমান করে না, অনাদর করে না তাকে, করলেও প্রবল উদাসীনতায় সে উপেক্ষা করত। তার আর সেইসব সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই, কম্পন নেই। ভিতরটা যেন পাথর।

দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। চান্দ্রেয়ী ফি-বছর নতুন ক্লাসে উঠল, নতুন বই কিনল, নতুন কিছু ঘটনাও ঘটে গেল তার শরীরে। তবু কিছুই বদলাল না চান্দ্রেয়ীর। সেই হাস্যহীন করুণ মুখ, দু'চোখে ডুবন্ত মানুষের চাউনি, বাক্যহীন রয়ে গেল।

খুব কৃতিত্বের সঙ্গে না হলেও স্কুলের গণ্ডী ডিঙিয়ে গেল চান্দ্রেয়ী। মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণতর হলো। কারণ, সত্যপ্রকাশ আর ফি-শনিবার আসতে পারেন না। কাজ বেড়েছে। তবে অনিয়মিত আসেন। মা বরুণারও একই দশা। তাঁর কাছে আবার চান্দ্রেয়ীকে যেতে হয়, যেটা চান্দ্রেয়ীর ভারী অপছন্দ। কারণ ওটা এক অচেনা জায়গা। তাই চান্দ্রেয়ী যাওয়া বন্ধই করে দিল। আশ্রয় নিল চিঠির। দু'তিন মাস বাদে বাদে দেখা হতে লাগল।

এ ক'বছর একটা জিনিস খুব সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে গেছে চান্দ্রেয়ী। সে তার বাবার বউ আর মায়ের বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেনি। সত্যপ্রকাশ ও বরুণা দুজনেই সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন ব্যাপারটা ঘটাতে, সহজ করতে। চান্দ্রেয়ী তার নরম করুণ ও অতিশয় বিনীত মুখ, বাক্য ও হৃদয় দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে সত্যপ্রকাশের বউ সত্যপ্রকাশকে বলেছে, তোমার মেয়ে তো আমাকে পাত্তাই দেয় না। আর বরুণার বর তাঁকে বলেছেন, মাই গড, সী ইজ এক্সট্রিমলি স্টাবোর্ন। অথচ চান্দ্রেয়ী তার মা-বাবার বরাবরকার বাধ্য মেয়ে। ভারী নরম মন, ভারী ব্যক্তিত্বহীন।

মা-বাবার সঙ্গে অপরিচয়ের এই ব্যবধান ধীরেধীরে রচিত হতে লাগল।

শুধু ঠাকুমা আর একটু কাছে এগোতে পারলেন। সেও চান্দ্রেয়ী এগোতে দিল বলে।

চান্দ্রেয়ী ফ্রক ছাড়েনি। মাঝে মাঝে চুড়িদার পরে। শাড়ি পরতে ভালবাসে না। ঠাকুমা বললেন, শাড়ি পরতে শেখ। বড্ড ধিঙ্গি হয়েছিস। শাড়ি না পরলে আর মানাচ্ছে না।

ও বাবা! শাড়ি পরে ডেলি প্যাসেঞ্জারি?

সব মেয়েই পরে। তুই কি আলাদা জীব?

বলতে নেই, পৃথিবীর আর কারও সঙ্গে নয়, শুধু এই

ঠাকুমার সঙ্গেই চান্দ্রেয়ীর মাঝে মাঝে মৃদু ঝগড়া হয়। শাড়ি পরা নিয়ে, দুধ খাওয়া নিয়ে, আপেল খাওয়া নিয়ে, শীতকালে গায়ে সর্ষের তেল মাখা নিয়ে। তবে ঠাকুমা যা চান তা হয় না, শেষ অবধি চান্দ্রেয়ী যা চায় তাই হয়।

ঠাকুমা মাঝে মাঝে খুব অবাক হয়ে বলেন, তোকে দেখে কে বলবে যে তুই এত জেদী। মুখে কথাটি নেই, কিন্তু ভিতরটা তো গিঁটমারা।

চান্দ্রেয়ী যে সাজে না এটাও একটা অনুযোগ। ঠাকুমা বলে, কাকীমারা বলে, তুই অমন রুখুসুখু থাকিস কেন। একটু সাজলে তো ভাল দেখায় তোকে।

চান্দ্রেয়ী কি করে বোঝাবে যে, নিজেকে নিয়ে তার আর কোনও ভাবনা নেই। নিজেকে সে বহুকাল আগেই হারিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু যে কদিন বেঁচে থাকা যায় বেঁচে আছে। কোনওরকমে। তার মা বা বাবার যদি বিচ্ছেদের আগে হঠাৎ মৃত্যু ঘটত তাহলে খুব শোক পেত চান্দ্রেয়ী, কিন্তু সুন্দর স্মৃতি তো থেকে যেত! তা হলো না। তাঁরা বাঁচলেন, যে সব সুন্দর ঘটনা ঘটত তার ছেলেবেলায়, যে সব সুন্দর স্মৃতি ছিল তা সত্যপ্রকাশ আর বরুণা যেন শেলেটের লেখার মতো ভেজা ন্যাতা দিয়ে মুছে ফেললেন।

যে মিশনারি স্কুলে সে পড়ত সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারির সময়ে কিছু সমাজসেবা করতে হলো চান্দ্রেয়ীকে। কাজটা তার খারাপ লাগল না। মিশনারিদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে কিছু সাহায্য আসে এ দেশের গরিবদের জন্য। সে সব উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিতরণ করা, বস্তি বা ঝুপড়িতে গিয়ে লোকগণনা, কার কত আয় তা জানা, টীকা দেওয়া ইত্যাদি। এ কাজে যিনি তাকে নামালেন তিনি একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী। মার্জোরি অ্যাডামস।

কাজটা ভারী পছন্দ হলো চান্দ্রেয়ীর। ঠিক এরকম কাজ

তো জীবনে সে কখনও করেনি। বাইরের জগৎটা তার কাছে কত অচেনা ছিল! কত মানুষের মুখ সে দেখেওনি কোনওদিন।

অ্যাডামস তাকে প্রায় শিশুকাল থেকে চেনেন। একদিন বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমাদের অর্গানাইজেশনে চাকরিও করতে পারো। বেতন সামান্য হলেও এটা তো ঈশ্বরের কাজ। তোমার জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঈশ্বরের কাজ করলে মনে শান্তি আসবে।

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে সে চাকরি করতে লাগল। সঙ্গে পড়াও চলছে। তবে কলেজে এবং কলেজটা বেশ নামী।

ঠাকুমা, আঁচ পেয়ে বললেন, সর্বনাশী মুখপুড়ি, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়ে ও কিসের চাকরি? আর চাকরির দরকারই বা কী? বাপ মা তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠাচ্ছে। রোদে রোদে ঘুরে রং জ্বলে যাবে, অসুখ বাধাবি। আর বস্তির লোকেরাও তো শুনি, ভারী পাজি।

সবই শান্তভাবে শুনে যায় চান্দ্রেয়ী। ভাবটা যেন, এক্ষুণি সব মেনে নেবে। কিন্তু যারা তা ভাবে তারা ভারী ভুল করে।

ঠাকুমাও জানেন, চান্দ্রেয়ী যা ঠিক করেছে তাই করবে। তবু বলার ভাগ বলেন।

কো-এডুকেশন কলেজ বলে নয়, তার আগে থেকেই, অর্থাৎ শরীরে নতুন সব কাণ্ড ঘটবার পর থেকেই পুরুষের চোখ এবং লোভ চান্দ্রেয়ী বড্ড টের পায়। কলেজে ঢোকবার পর থেকেই ছেলে-বন্ধুদের কেউ কেউ একটু ঘনিষ্ঠতর হতে চাইতে লাগল।

চান্দ্রেয়ী 'এই নতুন ব্যাপারে ভারী সিঁটিয়ে যেতে লাগল। এ ব্যাপারটা তার আদপেই সহ্য হলো না। তার ভিতরটা এত শুকনো, এত কঠিন যে সেখানে কোনদিনই কোনও মেঘলা ছায়ার সম্ভাবনা নেই।

তবে সে পুরুষদের সঙ্গেও এমন ব্যবহার করত যাতে প্রথম প্রথম মনে হয়, আহা রে, মেয়েটা কী নরম, কী শান্ত, কী

দুখী, কী একা, ওর একজন শক্তসমর্থ সঙ্গী চাই।

কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গকামী ছেলেদের মোহভঙ্গ হতে লাগল। চান্দ্রেয়ীর ধাত যে ভারী খটখটে, আর তাকে যে নোয়ানো যায় না এটা তারা ভারী বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করে ফেলল।

চারটি বস্তি জুড়ে একটা সেবা-প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। প্রাইমারি এডুকেশন, হেলথ্‌, স্যানিটেশন এবং স্বাধীনবৃত্তি।

কাজটা বেশ ঝামেলার। বস্তির লোক বলেই যে মুখ্যসুখ্যু এবং বোকা তা তো নয়। আজকাল বস্তিতে যারা থাকছে তারা অনেক কিছু জানে। সাহায্য নিতে তারা প্রস্তুত, কিন্তু মাতব্বরি সহ্য করতে নারাজ।

কাজটা কঠিন বলেই যেন বেশী ভাল লাগল চান্দ্রেয়ীর। সে বেশ খাটতে লাগল।

৩

নচিকেতার দাড়ির গোড়া আজকাল কুটকুট করে। কুটকুট করে তার ঝুপসি চুলে ভর্তি মাথাও। আলতাবুড়ি বলে, তোর মাথায় উকুন হয়েছে, সব কামিয়ে ফেল।

কথাটা কানে নেয় না নচিকেতা। আলতাবুড়ি তার মতো করে নচিকেতার ভাল করতে চায়। কিন্তু নচিকেতার একটা নিজস্ব রকমের ভালত্বের বোধও তো আছে! কিংবা নেই!

আজ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রোজকার মতোই সে দাড়ি চুলকোচ্ছে। উকুন হয়ে থাকলে দোষের কিছু নেই। সে যে জীবন এখন যাপন করছে তাতে এসব হওয়ারই কথা। পল্টুকাকার পরামর্শে সে দাড়ি গোঁফ রেখেছিল। একটা অক্ষম ছদ্মবেশ। তবে হয়তো খানিকটা কাজ দেয়। তার নামে পুলিশের হুলিয়া এখনও আছে। হয়তো তাকে তেমন করে খুঁজছে না পুলিশ। এতদিনে তাদের এলাকার থানায় অফিসার এবং পেয়াদারও বদল হয়েছে। বড়বাবু হয়তো রিটায়ারই করেছেন। কিন্তু কেস তো মরে না। কেস টিকে থাকে।

টিকে আছে সুজিৎ এবং তার দলও। রাজনৈতিক কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কি? ও পাড়ায় বা তার ধারে কাছে তাকে পেলে কী করবে তা কে জানে? ক্লাবে যে ছেলেটাকে রড দিয়ে মেরেছিল নচিকেতা, সে চারদিন পর হাসপাতালে মারা যায়। সে খবরটা চেপে রেখেছিলেন পল্টু।

নচিকেতা জানতে পারে প্রায় ছ'মাস বাদে। সুতরাং মিথ্যে খুনের কেস কপালদোষে সত্যি খুনের কেস-এ দাঁড়িয়ে গেছে। জীবনে সে কখনও মারপিট করেনি। গায়ের জোর, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। তবু তার হাতের রড সেদিন কালান্তক হয়ে উঠল কেন তা অনেকবার ভেবে দেখেছে সে। তার দাদু মন্মথনাথ লাঠিবাজ ছিলেন, সে হলো থার্ড জেনারেশন। দাদুই কি জেগে উঠেছিলেন তার মধ্যে? তবে মন্মথনাথ কখনও খুনটুন করেননি। সে করেছে। তফাৎটা এখানেই।

শরীর এবং মেজাজ ভাল থাকলে আলতাবুড়ি তাকে সকালের চা-টা দেয়। কিন্তু শরীর আর মেজাজ দুটোকে একসঙ্গে ভাল রাখা আলতাবুড়ির পক্ষে বড় একটা ঘটে না। ইদানীং নানা ঝামেলায় ভাজা ভাজা হচ্ছে বুড়ি। অনেককাল আগে স্বামী ত্যাগ করে দিয়েছিল, দিয়ে আর একটা বিয়ে করে বসল। তা এরকম এ সমাজে আকছার হয়। আলতাবুড়ি এসে এই বস্তিতে ডেরা বাঁধল। একাবোকা মানুষ। ছেলেপুলেও হয়নি। লোকের বাড়ি কাজ করে একরকম চলে যেত। আর একটা জিনিসও ভাল পারত সে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গিন্নিমাদের পা গরমজল সাবানে চুবিয়ে ঝামা ঘষে ময়লা তুলত, তারপর যত্ন করে মুছে নিখুঁত হাতে আলতা পরিয়ে দিত। সেই থেকে নাম হলো আলতাবুড়ি। বিশ বছর ধরে এইরকম করে করে পয়সা জমিয়ে একরকম সুদিন এনে ফেলেছিল প্রায়? কিন্তু পয়সা জমানো কার জন্য? সুখ কাকে নিয়ে? একা একা কি আনন্দ হয় কারও? তা ভগবান বোধহয় মনের কথা টের পেলেন। হাড়হাভাতে বরটা একদিন নাচার হয়ে এসে জুটল। শরীর ভাল নয়, সংসারেও আদর নেই, সাতখানা পেটই বা চলে কি করে?

আলতাবুড়ি তার বরের ভূত ঝাড়ল বটে, অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কথা দিয়ে তা বলে ফেলল না। যত্ন করে ঠাঁই দিল। রীতিমতো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাল। শরীরে বল আনার জন্য

ভালমন্দ খাওয়াল। স্বামী বলতে লাগল, তুই হলি নারীরত্ন।

দু-চার বছর ঘুরতে না ঘুরতে বরের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেপুলেরাও একে একে জুটতে লাগল। মোট পাঁচজন। ইতিমধ্যে সতীন মরে হাড় জুড়োলো। আলতাবুড়ির সংসার তখন ভরা। আরও দু-চার বছর পর একদিন স্বামী মরল। কিন্তু সৎ ছেলেমেয়েরা তো আর ফেলনা নয়। আলতাবুড়ি তাদের ফেলল না। ফেললে কাকে নিয়েই বা থাকবে?

তবে ইদানীং ছেলেপুলেরা চালাক হয়েছে। প্রায়ই বলছে, টাকা পয়সাগুলো বাঁটোয়ারা করে দে। টাকার পুঁটুলি নিয়ে কি সগ্‌গে যাবি?

আলতাবুড়ি টাকা পয়সা নিজের ঘরে রাখে না কখনও। তার টাকা জমা আছে লাহিড়ীবাড়ির গিন্নিমার কাছে। টাকা বসেও নেই। গিন্নীমা কিসব কাগজপত্র কিনে রেখেছেন তার নামে। টাকা বাড়ছে। ক'বছরে যেন ডবল হবে। ছেলেপুলেরা তা জানে। ইদানীং তাই জ্বালাতন করে মারছে।

তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সব কটাই মুখ্যু, বোকা। আলতাবুড়ি কাঁকড়াবিছে আর তেঁতুলবিছের তেল তৈরি করতে পারে। বিছে ধরে, মেরে, তেলে চুবিয়ে তবে তৈরি হয় তেল। সাক্ষাৎ বিষহরি। বড় ছেলেটা সেই তেল বিক্রি করে বেড়ায়। আর একটাকে আলতাবুড়ি নিজের হাতে ঠোঙা বানানো শিখিয়েছে। দুটো মেয়ে ঝি-গিরি করে, আবার আলতাও পরাতে শিখেছে। ছোটো ছেলেটা পাঠশালায় পড়ে। এই হলো সংসার। বড় মেয়েটার বিয়ের কথাও চলছে।

কিন্তু এই সতীনের ছানাপোনারা ইদানীং বড় জ্বালাতন করছে তাকে। বড় ভাজা ভাজা হচ্ছে আলতাবুড়ি। সকালে চা-টুকু দিতে এসে খানিকক্ষণ বসে আর ঝুড়ি-ভরা দুঃখ নামিয়ে দেয় নচিকেতার কাছে।

তারা কি মামলা করতে চাইছে বুড়ি?

তাও চায়।

মামলা করতে পয়সা লাগে।

পয়সা তাদের আছে। সারাদিন আমি বাড়িতে থাকি না, কত কী নিয়ে বেচে দিচ্ছে। খুচরো পয়সাটয়সা যেখানে যা রাখি সব নিয়ে নেয়।

ঝাঁটা মেরে তাড়াতে পারো না?

পারি। তারপর থাকব কাকে নিয়ে? মানুষ ছাড়া কি মানুষের চলে?

তাহলে তো হয়েই গেল। নালিশ তবে কার নামে?

বলি কি ওদের মানুষ করে দে।

আমি করব মানুষ? আমি নিজেই মানুষের মধ্যে নই।

তুই যে কত বইটই পড়িস বাপ্। তোর অনেক বিদ্যে।

বই-পড়া কি বিদ্যে বুড়ি? ও বিদ্যেয় এসব হয় না।

তাহলে কুসমিকে বিয়ে কর। আমরা অবশ্য ছোট জাত, কিন্তু তুই তো ওসব মানিস না।

খুব হাসে নচিকেতা, বিয়ে! তার বিয়ে!

খাওয়াবো কী বুড়ি? পরাবো কী? আমার হাঁড়ির হাল দেখছো না?

দেখছি, কিন্তু তোর মুখ দেখেই মনে হয় তুই ঠিক এমনধারা নোস। ইচ্ছে করলে কি আর রোজগেরে হতে পারবি না? আর কুসমির কীই বা চাই বল? গয়না গাঁটি না, বেনারসী-টসী না, কেবল ভাত আর ট্যানা।

ভাত আর ট্যানাই কি সোজা হলো? সতীনের মেয়ের জন্য অত ভাব কেন?

সতীন না হয় পর। কিন্তু সেই মিনসের রক্ত তো গায়ে আছে। ফেলব কী করে বল!

তুমি বেশ মজার লোক বুড়ি।

তা সেই মজার লোক আজ চা নিয়ে এল না দেখে খানিকক্ষণ আলস্যে তার নোংরা বিছানায় বসে রইলো নচিকেতা। বউ হলে চা দিত। করে ফেলবে নাকি কুসমিকেই বিয়ে?

কুসমি কেন, তাকে বিয়ে করার আরও দু'চার জন উমেদার আছে এখানে। গোবিন্দর বউ আশমনির বয়স কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। এই কাঁচা বয়সে বউটা এত পুরুষের মাঝখানে একা একা কাটায়। গোবিন্দ জেলখানার বাইরে বড়-একটা থাকতে পারে না। ছিঁচকে চুরির দায়ে আগে নাকি প্রায়ই ধরা পড়ত। বিয়ের পর বউকে খুশি রাখতে গিয়ে বড় চুরিতে হাত দিয়েছিল। মেয়াদও হয়েছে বড় রকমের। আর তিনটি বছর ঘানি ঘোরাতে হবে। তাই চোর-গোবিন্দর বউ আশমানি অনেক কেঁদেকেটে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ঠিক করেছে, ওই চোরের ঘর আর নয়। লাভ কী? জেলের বাইরে ওকে কি রাখবে পুলিশ?

শোনো ঠাকুরপো, একটা ভারী গোপন কথা তোমার সঙ্গে।

বলো।

পাঠাগার স্থাপিত-১৮২৭ খুলনা

বয়সে আমি তোমার চেয়ে ছোটই তো!

তা তো বটেই।

দেখতে কেমন আমি?

বেশ তো চেহারাখানা।

একটু কালো তাই না?

কালো কিছু খারাপ নয়। তুমি তত কালোও নও।

তার চেয়েও বড় কথা কী জানো? আমি কিন্তু ভালো।

ভালই তো। কিন্তু সেব কথা কী জানো? আমি কিন্তু।

একাবোকা থাকতে পারি, বলো?

তাহলে বাপের বাড়ি চলে যাও।

তুমি তো বলেই খালাস। বাপের বাড়ি কোথায় জানো? সেখানে কে আছে জানো?

না, তা জানি না।

সব মেয়ের বাপের বাড়ি থাকে না। আমার নেই। আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই। সংসারও চলছে না।

তোমার সংসারও আছে নাকি?

ওটাই সংসার। ঘরভাড়া, রেশন, বাজার। একটা মানুষেরও ওসব লাগে।

তা লাগে।

আর একজন পুরুষ মানুষও লাগে।

বটে!

ওরকম করে ঠাট্টার সুরে কথা বোলো না। খুব ফেলনা নই। বেশ রাঁধতে পারি। যত্নআত্তি জানি। চা করতে পারি। কফিও।

কী বলতে চাইছো খোলসা করে বলবে?

মুখ ফুটে বলতে হবে? বোঝোনা?

বুঝছি। ঘাড়ে চাপতে চাইছো। তাই তো?

আমি কি পেত্নী যে ঘাড়ে চাপবো। বরং উল্টোটাই। তোমার ভার ঘাড়ে নেবো।

পাত্রের কি অভাব আশমানি? ওই তো মদন রয়েছে, বিশে রয়েছে, মুর্গী-জগাই রয়েছে। যাও না, বলে দেখ। লুফে নেবে।

ইস, কার সঙ্গে কার তুলনা!

কেন ওরা কি খারাপ? মদন অটো রিক্সা চালায়, দোহাত্তা রোজগার,মিটারে চলে না, জানো তো? আর রাত দশটার পর তো মানুষ জবাই করে বেড়ায়। বিশের নিজের চালের দোকান। মুর্গী-জগাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। মুর্গী বেচে তার মাসে হাজারের ওপর থাকে কিনা।

শোনো ঠাকুরপো পয়সা,আমারও কিছু আছে। গোবিন্দ কিছু সোনা মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিল। পয়সার অভাব ভাবো নাকি আমার? আমার লালচ নেই। আলতাবুড়ি কুসমিকে তোমার সাথে ঝোলাতে চাইছে? কুসমির দিকে নজর দিও না। আঁটুল ওকে দেগে রেখেছে। ওই যে উত্তম সেলুনের আঁটুল।

মিটিমিটি হেসে নচিকেতা বলে, অত চেনাতে হবে না। সবাইকেই চিনি।

শুধু গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে তুমি আমাকে

চাইছো না। তাই তো? তোমাদের ভদ্রলোকদের বড্ড শুচিবাই। অত ধরলে চলে নাকি? এখানে দেখ তো কজন টাটকা বউ নিয়ে ঘর করছে? বেশির ভাগই তো হাত-ফেরতা। আমি এঁটো হলেও কম-এঁটো, বুঝলে? গোবিন্দ আমাকে পেল ক'দিন বলো। ও দোষটুকু যদি না ধরো তাহলে দেখবে আমি কেমন মেয়ে।

নচিকেতার লোভ যে হয়নি তা নয়। এই বস্তিতে আশমানির চেহারাখানাই তার চোখে সবচেয়ে ভাল ঠেকে। মুখখানা বেশ সুন্দর। তার চেয়েও ভাল ছোটখাটোর মধ্যে ছিপছিপে সতেজ শরীর।

নচিকেতার ওপর নজর মাতাল গণেশেরও। তার একটা মেয়ে আছে সোমথ বয়সের। প্রায়ই লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

মেয়েটা পাজি নয়, তাই রক্ষে। তবে বাপের তাড়নায় মাঝে মাঝে তাকে এসে নচিকেতার ঘরদোর পরিষ্কার করতে হয়। এক আধদিন রেঁধেও দিয়ে যায়। সেই সুবাদে টাকা ধার চায় গণেশ।

টাকা এখন মস্ত সমস্যার ব্যাপার নচিকেতার কাছে। তার তবিল প্রায় শূন্য। ভরসা বলতে পল্টুকাকা। প্রায়ই আসেন।

কেমন রে, ভাল তো!

পল্টুকাকা, এবার কী হবে?

চেপে বসে থাক না, দিন তো কাটছে।

এটা কেমন দিন কাটছে কাকা? কাজ নেই, কর্ম নেই।

ওদিককার খবর তো ভাল নয়। হুলিয়া ঘুরছে। তবে বাড়ি এখনও কেউ দখল নিতে পারেনি, এইটেই যা ভরসা।

দখল একদিন নেবেই।

পল্টু উদাস হয়ে গিয়ে বলেন, তা অবশ্য নেবে। তোর জামাইবাবু অনেক চেষ্টায় দলিলের কপি বের করেছেন কোর্ট থেকে। ওয়ারিশ নিরুদ্দেশ বা মৃত প্রমাণ করতে পারলে তোর দিদি হবে মালিক। তারপর আর দেখে কে?

তাহলে ভরসা কোথায় বলুন ?

থালাবাসন সব বিক্রি করেছি। এই নে, তিনশো টাকা। আরও কিছু সামনের সপ্তাহে পাবি। দুটো ভাল বার্মা সেগুনের ভারী আলমারি ছিল। দাম মনে হয় হাজার উঠবে।

দিদি এসব বিক্রির খোঁজ রাখছে না ?

না। খোঁজ পাবে কি করে ? বাড়িতে ঢুকতে দিই না তো ! চাবি থাকে তো আমার কাছে। আর তোর জামাইবাবু আমাকে একটু ভয় খায়।

নচিকেতা করুণ মুখ করে বলে, দিদি জামাইবাবু আমার কোনও খোঁজখবর করে না, না ?

পল্টু হাসলেন, হয়তো করে। তবে তোর কুশল সংবাদের জন্য নয়। যদি সন্ধান পায় তবে ঝোলাবে।

নচিকেতা পৃথিবীর নিষ্করুণ দিকটা বলতে গেলে প্রথম টের পাচ্ছে।

পল্টু উদাস গলায় বলেন, বিপদে পড়লে মানুষের চোখ ফোটে, জ্ঞান বাড়ে, অনেক ভুল ধারণা ভেঙে যায়। তোর বকলমে জ্ঞান বাড়ছে। দুনিয়াটাকে একটু বুঝে নে।

নচিকেতা ম্লান একটু হেসে বলে, বুঝে আর লাভ কী বলুন। বেঁচে থাকাটাই যে তেতো লাগছে।

তেতোও একটা স্বাদ। ওটাও পেতে হয়। জীবনের প্রথম দিকটা তেতোই ভাল।

পল্টু দার্শনিক উদাসীনতায় একটু চুপ করে থাকেন। নচিকেতা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে।

পল্টু বললেন, তোর যা হলো তা দেখে বুড়ো বয়সে আমারও চোখ ফুটেছে। লোকে কত কষ্ট করে টাকা জমায়, সম্পত্তি করে। আর সেই সম্পত্তি নিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরে। আমি ভাবছি ছেলেপুলেগুলোর জন্য কিছু রেখে যাবো না। নিজেরা চরেবরে খাক।

নচিকেতা এ কথার আর কী জবাব দেবে ? চুপ করে থাকে।

খবর ভাল নয়। কোনো খবরই ভাল নয়। টাকার উৎসও শুকিয়ে এল। এইভাবে লুকিয়েই বা কি করে থাকবে সে ? আর কতদিনই বা থাকতে হবে। জীবনে অনিশ্চয়তার মতো সংকট আর কীই বা আছে ?

পল্টুকাকা, আমি একটা কাজ চাই। যে কোনও কাজ।

কাজ !

এভাবে বসে কতদিন থাকা যাবে ? আমার বয়সে কোনও ছেলে কি এভাবে জীবন কাটাতে পারে ?

জানি। কিন্তু তোর জীবনটা তো স্বাভাবিক নয়। প্রথম মামলাটা ধরছি না। সেই খুনটা তুই করিসনি, হয়তো খালাস পেতে পারতিস। কিন্তু ক্লাবের খুনটা তো তোর হাতেই হলো ! তার ওপর জলজ্যান্ত চোখে-দেখা সাক্ষী আছে।

খুন তো ইচ্ছে করে করিনি। নিজেকে বাঁচাতে করেছি।

সেটা তো ঠিক কথা। কিন্তু পুলিশ বা হাকিম তা শুনবে কেন ? যাকে মেরেছিস তার খুঁটির জোর আছে। তাছাড়া মামলা তো দূরের কথা, তার আগেই তোকে হাসিল করে শোধ নেওয়ার জন্য তারা তক্কে তক্কে আছে। রোজ দেখি, তোর বাড়ির চারধারে কিছু ছেলে চক্কর মেরে যায়। আমাকেও দু'একবার জিজ্ঞেস করেছে।

আমার জন্য আপনার কোনো বিপদ হয়নি তো !

পল্টু উদাস ভাবটা বজায় রেখেই বলেন, বিপদ কিসের ? আর হলে হয়েছে। তুই হলি মন্মথনাথের নাতি, তোকে রক্ষা না করলে গুরুর আত্মা কুপিত হবেন।

কি রকম বিপদ পল্টুকাকা ?

পল্টু হাসলেন, ওরে, আমার এখনও পুরোনো রক্ত আছে শরীরে। আমাকে বিপদে ফেলা খুব সহজ নয়। তবে হুমকিটুমকি এক আধবার ছেড়েছিল।

ব্যথিত মুখে নচিকেতা বলল, আমার আজকাল মাঝে মাঝে

ইচ্ছে হয় থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি। এভাবে আর থাকা যাচ্ছে না।

পাগল নাকি? ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। ক'টা দিন একটু কষ্ট কর। ভগবানের ইচ্ছে হলে উপায় একটা হবেই।

ভগবানের ইচ্ছের ওপর অনেকদিন ধরে নির্ভর করে আছে নচিকেতা। লাভ হয়নি। তাই সে ভরসা পেল না।

পল্টু বিদায় নেওয়ার পর অনেকক্ষণ হতাশায় ডুবে থাকে নচিকেতা। কিন্তু তার বয়সটাই এমন যে হতাশার ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাছাড়া এই পরিবেশটাও তাকে বেশিক্ষণ মুহ্যমান থাকতে দেয় না। সবসময়েই এখানে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটছে। ঝগড়া লাগে, মারপিট লাগে, কাউকে ভূতে ধরে, শীতলাপুজো হয়, সমাজসেবীরা আসে, এর বউ নিয়ে ও পালায়, দুম করে কেউ মরে যায়। এই বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে নচিকেতা মিলিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

বাইরে থেকে একটা ঝগড়ার আওয়াজ আসছিল। বেশির ভাগ ঝগড়াকেই উপেক্ষা করে চলে নচিকেতা। সেগুলো রক্তারক্তি অবধি গড়ায় না। কিন্তু কতগুলো ঝগড়া আছে যা শুরু হয় নিরীহভাবে, কিন্তু লহরে লহরে উঠে রক্তারক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়।

বাচ্চা একটা ছেলে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, কাকা লোক এনেছে নচুবাবু।

নচিকেতাকে নানা নামে ডাকা হয় এখানে। নচুবাবু তার মধ্যে একটা।

সে তড়িতে উঠে বসে বলল, লোক এনেছে! তার মানে?

বাঃ, গেল শনিবার ঝগড়ার সময় বলল না, ভাড়াটে গুণ্ডো দিয়ে তোমাকে টিট করব! সেই তারাই এসেছে।

নচিকেতা দড়ি থেকে শার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে

এল। বস্তি ছাড়লেই পোদ্দারদের মাঠ। ত্রিশ কাঠার ওপর ঘেরা জমি। ঘেরার দেয়াল অবশ্য ভেঙে দিয়েছে রেললাইনের ধারের ঝুপড়ির লোকেরা। মাঠ পেরিয়ে বাজারে যেতে শর্টকাট হয় তাতে। নইলে অনেকটা ঘুরে লেভেল ক্রসিং হয়ে আসতে হয়।

এই মাঠটাতে একসময়ে খুনোখুনি কিছু কম হয়নি। লাশ নামানোর পক্ষে একসময় জায়গাটা ভারী উপযুক্ত ছিল। চারধারে তখন বসতি ছিল না। আজকাল হয়েছে।

নচিকেতা বাইরে এসে দেখল, পোদ্দারদের মাঠে অন্তত দশ বারোজন লোক। হাতে লাঠি আছে, বড় বড় ড্যাগার আর চপার আছে। বেশ নির্বিঘ্নে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাবভাব।

পোদ্দারদের জমি পাহারা দেয় সামন্ত। তার একখানা ছোট ঘর আছে। পাশে আর একখানা ঘর তুলে থাকে কালু, সামন্তর ভাই। দুজনে বনিবনা নেই। অনেককাল ধরে বিবাদ চলছে। ঝাড়পিট কম হয়নি। কিন্তু এতকাল এতদূর গড়ায়নি কখনও।

বাইরে দাঁড়িয়ে আজ তড়পাচ্ছিল কালু একা। সামন্তর ঘরের দরজা বন্ধ। ভয়েই। টুঁ শব্দটি নেই।

বাচ্চা ছেলেটার নাম শুখো। সামন্তর ছেলে। সে করুণ মুখ তুলে বলল, মা আমাকে পিছনের জানালা গলিয়ে নামিয়ে দিয়ে বলল, ছুটে গিয়ে নচুবাবুকে বল। সে বাঁচাতে পারবে। নইলে রক্ষে নেই।

নচিকেতা যে অরণ্যদেব তা নয়। আসলে সে লেখাপড়া জানা লোক, কিছুটা ভদ্রস্থ এবং মাথাও ঠাণ্ডা বলে সালিশীটা ভাল পারে। অনেক ঝগড়া বিবাদ সে সাময়িক মিটিয়েছে। কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডাদের কী করে ঠেকাতে হয় তা সে জানে না।

নচিকেতা এগিয়ে গিয়ে ডাকল, কালু!

কালু একবার পাগলাটে চোখে ফিরে দেখল তাকে, তারপর

আঙুল তুলে বলল, ঘরে যাও নচুবাবু। আজ শালা এর মধ্যে এসো না। আজ ফাইন্যাল হয়ে যাবে।

ওরা কারা?

ওরা আমার লোক।

ওদের চলে যেতে বল।

তোমার হুকুমে নাকি শালা? বলছি ঘরে যাও, এর মধ্যে এসো না। ভাল হবে না।

চারদিকে বহু লোকের ভিড়। তবে প্রকাশ্যে কেউ আসছে না। আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইসব সাংঘাতিক ঘটনা এদের কাছে একটা এন্টারটেন্টমেন্টও তো।

নচিকেতা ফের বলল, খুন-খারাপি করতে চাস?

চাই। তাতে তোমার বাবার কী? আমাদের মধ্যে হচ্ছে, তুমি নাক গলাতে এসো কেন?

তোর ভাল হবে না কালু।

কী করবে তুমি? বই-বাবু আছো। তাই থাকো। চোখ রাঙাচ্ছো নাকি শালা? আব্বে আবু, দে তো শালাকে ভরে।

আব্বুর হাতে লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি। আর লাঠি দেখলেই কার যেন ভর হয় নচিকেতার ওপর। সে কি তার দাদুর উত্তরাধিকার? তবু ভয়ে সিঁটিয়ে গেল নচিকেতা। ক্লাবঘরের দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সিনেমার ছবির মতো।

আবু নামে ছোকরাটা সামনে এসে দাঁড়াল। তড়পানি নেই। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ফোটো বাবু।

নচিকেতা ঘোর-লাগা চোখে কালো চেহারার ছোকরাটির দিকে চেয়ে বলল, আপনারা কি খুনটুন করবেন ভাই?

সেটা আমরা বুঝব। ঘরে যাও তো মাল।

নচিকেতা দেখল, কালু সামন্তর দরজায় লাথি মারছে। পলকা দরজা। ভেঙে পড়ল বলে। ভিতর থেকে আতঙ্কে বুকফাটা চিৎকার করছে সামন্তর বউ, মেরে ফেলল গো...পুলিশে খবর

দিচ্ছো না কেন তোমরা?

কালু যে সব অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছিল তা মানুষের কানে শোনা যায় না।

সামন্তর ঘরে বউ আছে, বুড়ি মা আছে, একটা কচি মেয়েও আছে। আর সামন্ত তেমন স্বাস্থ্যবান লোকও নয়। মারলে মরেটরে যেতে পারে।

নচিকেতার পথ আটকে আবু দাঁড়িয়ে। নচিকেতার এগোনোর প্রশ্নই নেই। সে চেঁচিয়ে বলল, শোন কালু, সামন্ত মরলে কিন্তু তোকে উচ্ছেদ হতে হবে। সামন্তই পোদ্দারদের মাইনে-করা চৌকিদার। তার জোরেই তুই এখানে আছিস।

কালু শুনতে পেল কিনা কে জানে। তবে আবুর লাঠিটার একটা খোঁচা এসে লাগল নচিকেতার পেটে, আবে বাঞ্চো, ফোটো শালা...

দরজাটা মড়াক করে খিল ভেঙে খুলে গেল। আলুথালু বেশে সামন্তর বউ প্রায় আছড়ে পড়ল চৌকাঠে, কী করছো তুমি কালু ভাই? অ্যাঁ! মেরে ফেলবে আমাদের? গুণ্ডা এনেছো?

কালুকে এক ঝটকায় সরিয়ে ভাড়াটে লোকেরা জায়গা নিয়ে নিল। একজন সামন্তর বউকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

একবার ছাড়া নচিকেতার জীবনে মারপিটের কোনো ট্রাডিশন নেই। মাত্র একবারই। তাও প্রাণ বাঁচাতে। এবং সেই স্মৃতিও এমনই রক্তাক্ত ও ভয়াবহ যে, নচিকেতা আর প্রাণ থাকতে ওপথে যাবে না, ঠিক করে রেখেছে। আবুর লাঠির খোঁচায় সে তাই দশ হাত পিছিয়ে এসেছে। কাঁপছে ভয়ে।

চোখের সামনে সামন্তকে চুল ধরে বাইরে টেনে আনল গুণ্ডাটা। কী নির্বিকার ভাবভঙ্গি! যেন মরা ইঁদুর ফেলছে। সামন্তর বউ আর মা এমন দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচাচ্ছে যে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সামন্তর পিছু পিছু কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসতে

গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল তার পাঁচ বছর বয়সের মেয়েটা।

সামন্তও কিছু ভাল লোক নয়। কালু আর সে গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ। তবু আজ তার অবস্থা দেখলে যে-কারও মায়া হবে।

নচিকেতা দেখতে পেল, সামন্তর ঠোঁট ফেটে টসটস করে রক্ত পড়ছে। তিন-চারজনের হাতে টালমাটাল হচ্ছে সে। হয়তো প্রাণে মারবে না। কিন্তু হিসেব করে এমন মার মারবে যাতে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়।

কিন্তু নচিকেতা কী করবে? তার আর কীই বা করার আছে? একটা প্রতিবাদ করার ছিল, করেছে। এখন তার সরে পড়াই উচিত।

ফিরতেই যাচ্ছিল সে। ঠিক এসময়ে নজর পড়ল, কালু বাচ্চা মেয়েটাকে একটা লাথি কষাল। খুব জোরে। লাথির চোটে মেয়েটা ছিটকে গেল কয়েক ফুট।

আবু নচিকেতাকে ছেড়ে ঘটনাস্থলে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

নচিকেতা দ্বিধাহীন পায়ে এগিয়ে গিয়ে আবুর হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিল। কিভাবে নিল তা সে নিজেও পরে ভেবে পায়নি। শক্ত মুঠোতেই ধরা ছিল লাঠিটা। আবু নেহাৎ দুর্বল লোকও নয়, তবু নিল।

তারপর কী হলো কে বলবে? মন্ত্রশক্তি গল্পের ঈশ্বর পাটনীর বোধহয় এরকমই হতো। ভর। দাদু মন্মথনাথই ভর করলেন বোধহয়।

তার হাতের কালান্তক লাঠির বিদ্যুৎ-গতি আর প্রবল মার চোখের পলকে ছত্রভঙ্গ করে দিল গুণ্ডাদের। কালু প্রায় আছড়ে পড়ল গিয়ে দেয়ালে।

তারপরই মাঠ ফরসা। সুনসান।

আতঙ্কে নিজের কীর্তির দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকল

নচিকেতা। এটা কী হলো? গুণ্ডাদের মধ্যে তিনজন ছাড়া বাকিরা লম্ফ দিয়েছে। তিনজন নিথর হয়ে পড়ে আছে ঘাসে।

মানুষজন নিঃশব্দে এসে জড়ো হলো চারধারে। ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন এসে নচিকেতার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে এনে দরজাটা দড়াম করে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নচিকেতার মাথাটা পুরো ভোম্বল হয়ে আছে এখনও। সে বুঝতেই পারছে না, কী থেকে কী হয়ে গেল। আবার কি খুন করে বসল সে? আবার কি পুলিশ তাকে খুঁজবে? সে কি আর কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না?

প্রায় মিনিট কুড়ি নিঃঝুম হয়ে অর্ধচেতনার মধ্যে বসে রইল নচিকেতা।

তারপর বাইরে একটা গণ্ডগোলের শব্দ কানে এলো। পুলিশ এলো নাকি?

গণেশের মেয়ে শবরী এসে উঁকি দিল দরজা ফাঁক করে।

নচুবাবু!

কী বলছো?

ওখানে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। সেই যে বাবুবিবিরা আসে আমাদের ভাল করতে তারা সব এসেছে।

কী চায় তারা?

সবাই তাদের ঘিরে খুব গাল দিচ্ছে।

কেন?

তারা যে সব গুণ্ডোদের ওযুধপত্র দিচ্ছিল। ইস... তোমারও কপাল কতটা ফেটেছে, হাত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে! দেখনি?

এবার দেখল নচিকেতা। ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে চামড়া অনেকটা চেরা, কপালে মস্ত ট্যাম।

নচিকেতা উঠল।

কোথায় যাচ্ছো?

পুলিশ আসেনি তো!

না। তবে আসবে। তুমি বরং আমাদের ঘরে গিয়ে পালিয়ে থাকো।

নচিকেতা একটু হাসল। বলল, পালিয়েই ছিলুম। এবার বেরোতে হবে, বুঝলে! আর পালিয়ে লাভ নেই।

নচিকেতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মাঠে এসে দাঁড়াল। সবাই কয়েকজন মহিলা ও পুরুষকে ঘিরে যা খুশি তা বলছে। অশ্রাব্য নয়, কিন্তু যথেষ্ট অপমানজনক। ভিড়ের মধ্যে ভদ্র চেহারার জনা চারেক নারী পুরুষ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে।

নচিকেতা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই সবাই পথ ছেড়ে দিতে লাগল।

নচুবাবু!

তোরা ঘরে যা।

আরে, ওরা যে সব গুণ্ডাদের ওষুধপত্র দিচ্ছে। ওরা আমাদের খুন করতে এসেছিল না?

নচিকেতা কড়া গলায় বলল, ঘরে যাও সব।

ঘরে অবশ্য কেউ গেল না। কিন্তু সভয়ে চুপ মারল। নচুবাবুকে আজ তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

আগন্তুক দুটি ছেলে ও দুটি মেয়েকে নচিকেতা ঠিক চেনে না। তবে এরা যে বস্তি উন্নয়ন করতে মাঝে মাঝে আসে তা জানে। এটা ওদের সেবাধর্ম নয়, বোধহয় রিসার্চ ওয়ার্ক। আজকাল এসবও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনতালিকায় ঢুকেছে বোধহয়।

একটি মেয়ে বিবর্ণ মুখে নচিকেতার দিকে চেয়ে বলল, আমাদের কী দোষ বলুন তো! আমরা কয়েকজন উণ্ডেড লোক দেখে ফার্স্ট এইড দিচ্ছিলাম। আর তো কিছু করিনি।

করুন না। ভালোই তো।

এরা যে আমাদের বাধা দিচ্ছে।

আর কেউ কিছু বলবে না। আপনাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার আছেন?

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, না। তবে আমরা ফার্স্ট এইড ট্রেনড।

ঘাসে-পড়ে-থাকা চারটে লোকের দিকে সভয়ে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে নচিকেতা বলল, এদের কণ্ডিশন কেমন দেখছেন?

একজনের হেড ইনজুরি। হাসপাতালে না নিলে বোঝা যাবে না। কন্‌কাশন হয়ে থাকলে সিরিয়াস কেস। অন্য তিনজনের সুপারফিসিয়াল উণ্ড।

ধীরে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ল নচিকেতা। বলল, আপানারা ফার্স্ট এইড দিয়ে যান। বাকীটা আমরা দেখব।

মেয়েটা সভয়ে নচিকেতার দিকে চাইল। বেশি কিছু জানতে চাইল না। শুধু স্বগতোক্তির মতো বলল, পুলিশে একবার জানানো দরকার কিন্তু।

নচিকেতা মেয়েটির দিকে বাধা চোখে চেয়ে চাপা গলায় বলল, পুলিশে কেন? ওরা ভাড়াটে গুণ্ডা। একজনের টাকা খেয়ে খুন-খারাপি করতে এসেছিল। ঝুপড়ির লোকেরা রুখেছে। এর মধ্যে পুলিশকে ডাকব কেন?

তাই নিয়ম। নইলে পরে পুলিশ এসে অনেক ঝামেলা করবে। সবাইকে ধরেও নিয়ে যেতে পারে।

সেটাও আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। দয়া করে আপনারাও পুলিশের কাছে যাবেন না। গেলে কিন্তু এই এলাকায় কাজ করতে পারবেন না।

চারজনের তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাল। শুধু আর একটি মেয়ে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মাথার চোটওয়ালা লোকটার ক্ষতস্থানে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিল। মুখে কথা নেই। ভারী নির্বিকার। মেয়েটা যখন উঠে দাঁড়াল তখন একটু রোগা, বিষণ্ণ ও গম্ভীর মুখশ্রীর মেয়েটির দিকে তাকাল নচিকেতা। কারও মুখশ্রী বিচার করার মতো মনের অবস্থা তার এখন নয়, তবু এই দুঃসময়েও মেয়েটির মুখে তার চোখ কয়েক

সেকেণ্ড আটকে রইল। মেয়েটা সুন্দর হতে পারে, কুৎসিতও হতে পারে, সেটা কথা নয়। কিন্তু এ মেয়েটির মুখে যে চেপে রাখা গভীর দুঃখের ছাপ রয়েছে সেটা বড় চেনা মনে হলো নচিকেতার। আর কিছু নয়। মেয়েটা তার দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল না, চেয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ বলল, আপনারও তো মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার।

নচিকেতা মাথা নেড়ে বলল, না। ও সেরে যাবে।

ডিজইনফেকট্যান্ট না দিলে সেপটিক হয়ে যেতে পারে। এ জায়গাটা এত নোংরা।

কিছু হবে না দিদিমণি। আমার কিছু হয় না।

প্রথম মেয়েটি ফের বলল, আমরা যাচ্ছি। আপনারা কিন্তু পুলিশে খবর দেবেন। আর ওই লোকটাকে হাসপাতালে দেওয়া খুব দরকার।

এই বলে চারজন চলে গেল।

কে যেন এসে খবর দিল, ক্লাবের ছেলেরা আর পাড়ার মাতব্বররা আসছে।

ক্লান্ত এবং কিছুটা হতচকিত নচিকেতা তার ঘরে ফিরে এল। এখন যা করার পাড়ার লোকেরাই করবে। পুলিশ এলেও আসতে পারে। নচিকেতা তার বিছানায় শুয়ে রইল চুপচাপ। সন্ধে হয়ে আসছে। তার ঘরের চারদিকে চাপা ফিসফাস এবং লোক জমায়েত হওয়ার আভাস পাচ্ছিল সে। সবাই বোধ হয় নতুন হীরোকে দেখছে।

কে যেন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে তার লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়ে গেল। নচিকেতা তাকাল না।

আলতাবুড়ি এল চা নিয়ে। সঙ্গে কিছু মুড়ি আর চানাচুর। বলল, খা ত বাবা, ওঠ।

চা-টুকুর খুব দরকার ছিল। নচিকেতা উঠে বসল।

আশমানি ডেটল আর ন্যাকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, ওই দিদিমণিদের একজন দিয়ে গেছে। এসো তো বেঁধে দিই।

লাগবে না।

আর একজন ঘরে ঢুকল লম্বা লাঠিগাছ নিয়ে, মাঠে পড়েছিল, তোমার জন্য নিয়ে এলাম নচুবাবু।

আনলে কেন?

এটা ওই আবু গুণ্ডার লাঠি, যা দিয়ে তুমি অত লোককে ঠ্যাঙালে। চিহ্ন হিসেবে রেখে দাও।

পুলিশ সার্চ করে লাঠি পেলে মুস্কিল আছে। ফেলে দাওগে যাও।

পাকা বাঁশের সলিড লাঠি। গাঁটগুলোয় পেতল জড়ানো। এমন সুন্দর দামী জিনিসটা ফেলব কেন? তুমি না রাখো আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু রাখলে তোমারই রাখা উচিত। এ লাঠি আমাদের ইজ্জত বাঁচিয়েছে। বাইরে থেকে গুণ্ডা আনাটা কালুর ঠিক হয়নি।

৪

তুই কি যণ্ডাগুণ্ডাকে ঠেকাতে যাস ?

চান্দ্রেয়ী সামান্য স্মিত মুখে হেসে বলল, না ঠাকুমা সে কাজ তো পুলিশের। আমরা শুধু সোশ্যাল ওয়ার্ক করি।

তাহলে কাল কী হয়েছিল ?

সেটা ওদের ব্যাপার। ঝগড়া মারামারি এইসব। তোমাকে ব্যাপারটা জানানোই ভুল হয়েছে।

ভুল হবে কেন ? সব কথা যে আমার জানা দরকার। বয়সের মেয়ে, ওসব খারাপ বস্তি টস্তিতে যাওয়ার কী দরকার তোর ?

আমার তো বেশ ভাল লাগে। এ কাজের মধ্যে যে কত আনন্দ আছে তা তুমি বুঝবে না।

বিপদ ও তো আছে।

একটুও নেই।

কী হয়েছিল ওখানে ?

বললাম তো। ভাড়াটে গুণ্ডারা এসে একজন লোককে খুন করার চেষ্টা করেছিল। বস্তির লোকেরা, আসলে একটা লোকই তাদের তাড়িয়েছে।

আজ আর তোর সেখানে গিয়ে কাজ নেই।

আমাকে কেউ কিছু বলবে না। ওরা জানে যে, আমি ওদের ভাল করতেই যাই। আর খবরটাও নেওয়া দরকার।

মিশনে সবকিছু রিপোর্ট করতে হয়।

পুলিশ যদি সাক্ষী দিতে বলে তাহলে দিবি ?

আমি তো কিছু দেখিনি। তবে উণ্ডেগুণ্ডদের কথা জিজ্ঞস করতে পারে। যা জানি বলব।

সাক্ষী দেওয়া কি ভাল ? ওরা যদি শোধ নেয় ?

সাক্ষী দিতে বলবে না। ভয় নেই। ঘটনার অনেক সাক্ষী আছে। আমরা তো গেছি সব হয়ে যাওয়ার পর।

কোনও বিপদকেই কেন যেন আর ভয় পায় না চান্দ্রেয়ী। তার জীবনের ভয়ভীতি চিন্তাভাবনার স্তর সে পেরিয়ে এসেছে। এখন যে জীবনটা সে যাপন করছে তা দুর্বহ বটে, কিন্তু নিস্তরঙ্গ। ঢেউ নেই, বুদ্বুদ নেই, অভিঘাত নেই। বুকের মধ্যে একখানা ঠাণ্ডা পাথরকে সে অনুভব করতে পারে। সে জানে এ পাথর কেউ কখনও ভাঙতে পারবে না।

ঝুপড়ি এলাকা আজ অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা, থমথমে। নিত্যদিনের চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি শোনা যাচ্ছে না।

কয়েক মাস আগে অনেক চেষ্টায় আন্টি মার্জোরি এখানে একটা স্কুল করতে পেরেছেন। মিশনের টাকায় অনায়াসে একটা স্কুল খোলা যেত। কিন্তু সেটা করে দিলে পরনির্ভরতার ঝোঁকটা বাড়বে বলে বস্তিবাসীদের উদ্যোগী বা মোটিভেটেড করে তুলে তাদের দিয়েই স্কুলটা করানোর নির্দেশ ছিল তাদের ওপর। চান্দ্রেয়ী এবং তার আরও চারজন সহায়ক কর্মী উঠে পড়ে লেগেছিল। আশেপাশে স্কুলের অভাব নেই। বস্তির অনেক ছেলেমেয়েই বিভিন্ন স্কুলে পড়ে। কিন্তু কিছু আছে যারা একেবারেই হ্যাভ-নটস। কিছু ছেলেমেয়ে আছে যাদের বাবা ঘোর অপদার্থ, মাতাল বা জুয়াড়ি। মা হয়তো মৃত, নয়তো অন্য কোনওভাবে থেকেও নেই। এইসব ছেলেমেয়ে প্রায় অনাথের মতো পথে পথে ঘুরে সময় কাটায় এবং বখে যায়। স্কুলটা এদের জন্যই। বাইরে থেকে ভাল করতে এলে অনেক সময়েই লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাই লোকের সঙ্গে ভাবসাব করে, শিখিয়ে পড়িয়ে

নিয়ে স্কুলটা করা হলো। একটা কাঁচা ক্লাবঘর আছে। রাতে সেখানে যাত্রা নাটকের রিহার্সাল হয়। দিনে সেখানে স্কুল বসল। বস্তিরই লেখাপড়া জানা একজন বউ পড়াতে লাগল। ক্লাবঘরের ভাড়া, শিক্ষিকার সামান্য বেতন এবং পড়ুয়াদের বইখাতা পেনসিল বাবদ টাকা দিচ্ছে মিশন। চান্দ্রেয়ীদের সাফল্যের সামান্য সাক্ষ্য দিচ্ছে আপাতত এই স্কুলটি। এটিকে কেন্দ্র করেই তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্কুল আজ বন্ধ। তবে সরমা চান্দ্রেয়ীকে দেখে স্কুলঘর খুলে বসাল। একটি মাত্র চেয়ার আছে স্কুলে। পড়ুয়ারা চাটাই পেতে বসে। আর আছে ক্লাবঘরের একটা কালো ট্রাঙ্ক। চেয়ারে চান্দ্রেয়ী আর ট্রাঙ্কে সরমা বসল। স্কুলঘরের পরিবেশ দমবন্ধ-করা গুদামঘরের মতো। কাছেই দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া হয়। অতএব সর্বদা এই ঘরে পচা গোবর ও কাঁচা ঘুঁটের গন্ধ থম ধরে থাকে।

আজ স্কুল বন্ধ কেন দিদি?

সরমা চোখ সামান্য বড় করে বলল, কাল যা কাণ্ড হয়ে গেল! আজ আর ভয়ে খুলিনি। ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

চান্দ্রেয়ী বলল, হাঙ্গামা তো এখানে প্রায়ই হয়। স্কুল বন্ধ রাখলে রোজই রাখতে হবে।

সরমা কথাটার ধার দিয়ে গেল না। চাপা গলায় বলল, এরকম কাণ্ড তো আর আগে হয়নি। নচুবাবু না থাকলে কী হতো বলো তো দিদিমণি! গুণ্ডারা সামন্তকে মেরে শেষ করে দিত।

চান্দ্রেয়ীর নচুবাবু লোকটাকে মনে পড়ল। লোকটাকে গুণ্ডারা মেরেছিল। হাত কেটেছে, মাথাও ফেটেছে, তবু ফার্স্ট এইড নেয়নি। লোকটার চোখে-মুখে একটা ভীষণ আতঙ্কের ভাব ছিল। জানতে চেয়েছিল চারজন গুণ্ডার মধ্যে কেউ মারা গেছে কিনা।

নচুবাবু কে বলো তো?

কাল দেখলে না! ওই যে যাকে তুমি ওষুধ দিতে চাইলে, নিল না।

জানি। কিন্তু সে কী করে?

কিছুই না। বস্তির লোক নয়। কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না। পদবী হলো মিত্র। অনেকে বলে নচুবাবু বড়ঘরের ছেলে। পালিয়ে আছে এখানে।

পালিয়ে আছে! কেন?

কে জানে বলো। আলতাবুড়ি জানতে পারে। আর কেউ নয়। নচুবাবুর তো জ্বর এসেছে রাতে। হাতটাও বিষিয়ে গেছে। কপাল যা ফুলেছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

চান্দ্রেয়ী সামান্য সচকিত হলো, সে কী? ডাক্তার দেখানো হয়েছে?

ডাক্তার ডাকতে দেবে নাকি? কেবল বলে, এমনিই সারবে। আলতাবুড়ি ওষুধ জানে, হাতকাটা তেল আর জরিবুটি লাগিয়েছে।

চান্দ্রেয়ী এইসব লোকের হিমালয়প্রমাণ অজ্ঞতা আর অদূরদর্শিতায় বিরক্ত হলো। বলল, ডাক্তার না ডাকার কোনও কারণ নেই। টেট ভ্যাক নেওয়া উচিত ছিল। পেনিসিলিন ইজ এ মাস্ট।

নচুবাবু কারও কথা শুনবে ভেবেছ?

সেই লোকগুলোর কী হলো, যারা মার খেয়েছিল?

তাদের পাড়ার ছেলেরা এসে তুলে নিয়ে গেছে। মনে হয় পুলিশেই দিয়েছে। সকালে পুলিসও এসেছিল। এই তো এতক্ষণ ধরে নানা জনকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে করে হয়রান করল। তুমি আসার একটু আগে জীপ আর ভ্যানটা গেল।

কাউকে অ্যারেস্ট করেছে?

পাঁচজনকে ধরেছে। কেউই মারপিটে ছিল না। তবে নচুবাবুর নাম তো কেউ বলেনি।

পুলিশ তো প্রথমে আসল লোককে ধরে না, যাকে তাকে

অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। তারপর তার কাছ থেকে নাম বের করতে থাকে। প্রসেস অফ এলিমিনিশন।

কেউ নচুবাবুর নাম বলবে না। কেটে ফেললেও না।

পুলিশ কাকে ধরবে না ধরবে তা নিয়ে চান্দ্রেয়ীর মাথাব্যথা নেই। সে বলল, তোমাদের নচুবাবুকে পারলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও। নইলে ব্যাপারটা সিরিয়াস দাঁড়িয়ে যাবে। এসব জিনিস নেগলেক্ট করতে নেই।

দিদিমণি, তুমি কথাটা আলতাবুড়িকে বুঝিয়ে বলে যাও। আলতাবুড়ির কী সব জারিবুটি আছে তাই নিয়ে তার ভারী গুমোর। তার ধারণা ডাক্তারবদ্যিরা কিছু জানে না।

ঠিক আছে, বলব। তাকে ডাকবে একটু?

চলো না। ওই তো নচুবাবুর ঘর। যাবে?

চান্দ্রেয়ীর আপত্তি নেই। সে সেবাকর্ম করতে এসেছে। আপত্তি কিসের? সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

যে ঘরে তাকে সরমা নিয়ে এল তা নোংরা বটে, কিন্তু ততটা নয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, টেবিলে এবং সস্তা কাঠের র‍্যাকে বিস্তর বই রয়েছে এবং সবই ইংরিজি। বেশ কঠিন বইও বটে। সরমা বলছিল বটে। নচুবাবু বড়ঘরের ছেলে। কথাটা হয়তো কেবল রটনাই নয়।

বিছানায় ঘোর-লাগা অবস্থায় পড়ে আছে লোকটা। একবার কপালটা আলতো হাতে স্পর্শ করে চান্দ্রেয়ী চমকে উঠল, অন্তত একশো তিন বা চার জ্বর। আর কপালে কালশিটেওলা মস্ত একটা ঢিবি।

এর মাথায় জলপট্টি দেওয়া উচিত ছিল সরমা। আলতাবুড়ি কই?

দাঁড়াও, ডেকে আনছি।

সরমা চলে গেলে চান্দ্রেয়ী ঘরের সামান্য আলোয় লোকটাকে ভাল করে দেখল। এ লোকটা কাল লাঠিপেটা করে চার-চারটে সশস্ত্র গুণ্ডাকে ঘায়েল করেছে, আরও পাঁচ-সাত জন এর

ভয়ে পালিয়ে গেছে। লোকটা অতি কঠিন ইংরিজি বই পড়ে। লোকটা বস্তিতে থাকে। লোকটা ডাক্তার দেখাতে ভালবাসে না। লোকটা তাহলে কিরকম? খুব মিস্টিরিয়াস নয়? ফেরারী আসামী নয় তো! বা বউ-খুন-করা স্বামী? পলিটিক্যাল অ্যাবসকন্ডার? জেল-পালানো কয়েদী? প্রেমে ব্যর্থ বিরহী? লোকটা আসলে কে? নচুবাবু! নামটারও তো মানে হয় না!

ঘরে একটা স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার দেখে তাতে বসল চান্দ্রেয়ী। ঘড়ি দেখল। বসে বসে আচ্ছন্ন লোকটাকে দেখছিল চান্দ্রেয়ী। নচুবাবু! কে এই নচুবাবু?

কোনও দুঃস্বপ্ন বা বিকারে লোকটা হঠাৎ চমকে ককিয়ে উঠল। বিকট একটা 'উঃ' বলে হঠাৎ চোখ মেলল। রক্তজবা চোখ। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসে চান্দ্রেয়ীর দিকে আতঙ্কে চেয়ে রইল।

পুলিশ! পুলিশ আসেনি?

চান্দ্রেয়ী মৃদু হেসে বলল, এসেছিল। চলে গেছে।

চলে গেছে! ঠিক জানেন?

জানি।

তাহলে আবার আসবে। উঃ। কী যে হয়ে গেল!

পুলিশ তো আসবেই। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন কে? শুনেছি আপনি ভাল কাজই করেছেন।

ওরা গুণ্ডা ছিল।

লোকটা সভয়ে চান্দ্রেয়ীর দিকে চেয়ে বলল, কেউ মরেনি তো?

বোধহয় না। শুধু হেড ইনজুরির লোকটা একটু আনপ্রেডিকটেবল। তবে মারা যাওয়ার মতো নয়।

ঠিক জানেন?

আমি তো কাল দেখে গেছি।

কখন যে কী হয়ে যায় বলা যায় না। ক্লাবের সেই ছেলেটাকে মারার পর থেকে আমার কী যে যাচ্ছে! কেন যে মারলুম!

লোকটার ভিতর থেকে জ্বরের ঘোরে কিছু কথা বেরিয়ে আসছে, চান্দ্রেয়ী বুঝতে পারল। বলল, আপনি শুয়ে থাকুন।

লোকটা ধপ করে বালিশে মাথাটা ফেলে চোখ বুজল। তারপর হঠাৎ আবার চোখ খুলে বলল, আপনি ওই ডু-গুডারদের দলের লোক না?

আমার নাম চান্দ্রেয়ী বসু।

লোকটা কিছু বলল না। উদাসভাবে ঘরের চালের দিকে চেয়ে রইল। ভাবখানা যেন, তুমি চান্দ্রেয়ীই হও আর যা-ই হও, আমার তাতে কী?

চান্দ্রেয়ী বলল, শুনলাম আপনি কোনও ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন না! ব্যাপারটা রিস্কি হচ্ছে। কোয়াকের চিকিৎসা কিন্তু অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে।

লোকটা ভারী বিরক্ত মুখ করে বলল, ওসব আমি জানি।

চান্দ্রেয়ী তার পাখির মতো সরু স্বরে বলল, তাহলে কেন একজন কোয়ালিফায়েড ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন না?

দেখিয়ে কী হবে? আমার আসল রোগ কোথায় তা সে ধরতে পারবে?

আসল রোগ! আপনার কি কোনও সিরিয়াস এইলমেন্ট আছে?

আছে।

কিরকম?

আপনি বুঝবেন না। আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম অ্যান আননোন ডিজিজ।

ডাক্তার ধরতে পারবে না? যদি খুব ভাল ডাক্তার হয়?

পারবে না।

আপনি ছেলেমানুষী করছেন।

লোকটা এ কথার জবাব দিল না। চোখ বুজল।

চান্দ্রেয়ী একদৃষ্টে চেয়ে লোকটাকে দেখছিল। কিরকম লোক এ? সাইকোপ্যাথ? স্পষ্টই বোঝা যায় এর মানসিক ভারসাম্য

কম। ও কি গুণ্ডা? খারাপ লোক?

লোকটা ফের রক্তজবা চোখ পট করে খুলে বলল, আমার খুব শীত করছে।

করারই কথা। কত জ্বর!

প্লীজ, ঘরের কোণে ওই যে লাঠিটা রাখা আছে ওটা কাইণ্ডলি সরিয়ে ফেলবেন? এক্ষুণি?

চান্দ্রেয়ী একটু হতভম্ব হয়ে গেলেও শেষ অবধি উঠল, কোথায় সরাব বলুন তো!

বাইরে ফেলে দিন।

চান্দ্রেয়ী লাঠিটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে চারদিকে চেয়ে দরজার পাশে দেয়ালে লাঠিটা দাঁড় করিয়ে রেখে এল। লোকটা দেখছিল তাকে। গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলল, পুলিশ আসছে না কেন বলুন তো!

পুলিশের কথা অত ভাবছেন কেন? আপনি তো তেমন কোনও অন্যায় করেননি!

কে বলল করিনি? বলে লোকটা কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিকে চাইল। তারপর কেমন বসা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, আমার নামে হুলিয়া আছে না?

আছে নাকি?

লোকটা প্রবল অস্থিরতায় বালিশের ওপর মাথাটা এধার ওধার নাড়তে নাড়তে বলল, পুলিশ খুঁজছে আমাকে।

চান্দ্রেয়ী আস্তে করে সাবধানে জিজ্ঞেস করল, কেন খুঁজছে? আপনি কী করেছেন?

লোকটা ফের তার দিকে চাইল। চাউনিতে স্বাভাবিকতার এত অভাব, মনে হয় যেন, পাগলের চোখ। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করে বলল, বড্ড তেষ্টা।

চান্দ্রেয়ী উঠে টেবিলের ওপর থেকে ঢাকা কাচের গেলাস নিয়ে লোকটার হাতে দিল। লোকটার হাত থরথর করে কাঁপছে।

আমি খাইয়ে দেব?

না, পারব।

বসে কাঁপতে কাঁপতেই জল খেল লোকটা। তারপর শুয়ে গায়ে আধময়লা বেডকভারটা জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে বলল, এত শীত! কোত্থেকে বাতাস আসছে কে জানে!

আপনার ব্যথা করছে না?

হ্যাঁ, ব্যথাও।

তবু ডাক্তার দেখাবেন না?

ডাক্তার এলে অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে?

কী কথা জিজ্ঞেস করবে?

কী জানি! আমি ভয় পাই।

দাড়িগোঁফওয়ালা লোকদের এমনিতেই ভারী রহস্যময় লাগে চান্দ্রেয়ীর। এ লোকটাকে আরও লাগছিল। এ গুণ্ডা পেটায়, কিন্তু ডাক্তারকে ভয় পায়। পুলিশকেও।

বললেন না তো আপনি কী অপরাধ করেছেন?

পল্টুকাকা সব জানে। ওঃ, সে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

আপনি কাউকে খুন করেছেন?

লোকটা অবাক হয়ে চান্দ্রেয়ীর দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি করে জানলেন?

চান্দ্রেয়ী মাথা নেড়ে বলে, আমি জানি না। আন্দাজ করছি।

লোকটা তার মাথার ফোলা জায়গাটায় একবার হাত দিল। কাতর একটা শব্দ করে বলল, আর সুজিৎ, সে খুঁজে পেলে আমাকে খুন করবে।

সুজিৎ কে?

সুজিৎ খুব সাঙ্ঘাতিক। আমার বড্ড জ্বর, না?

হ্যাঁ, খুব জ্বর। ডাক্তার দেখানো উচিত।

আমি কি ভুলভাল বকছি? কেমন যেন নিজের ওপর কন্ট্রোল নেই।

আপনি এখানে কেন আছেন বলুন তো? এটা তো আপনার জায়গা নয়?

কে বলল এটা আমার জায়গা নয়?

আপনাকে কি এখানে মানায়?

কেউ কি সন্দেহ করেছে?

না না। আমিই বলছি।

এটাই তো আমার জায়গা। আমার আর কিছু নেই।

কী ছিল আপনার?

বাড়ি ছিল। বাবার টাকা-পয়সা ছিল। সব গেছে।

কি করে গেল?

ওই যে খুনটা হয়ে গেল। কী করব, ওরা যে মারছিল আমাকে। পল্টুকাকা সব জানে।

পল্টুকাকা কে বলুন তো?

আছে একজন। আপনি চিনবেন না। কী যেন নাম বললেন আপনার?

চান্দ্রেয়ী বসু।

হ্যাঁ, চান্দ্রেয়ী। আচ্ছা আপনি কি আলতাবুড়িকে একটু ডেকে দেবেন?

তাকে ডাকতে লোক গেছে।

আমার ভীষণ শীত করছে।

এ ঘরে কি কাঁথা-কম্বল কিছু আছে?

না। আলতাবুড়ির কাছে আছে। আচ্ছা দাঁড়ান, আমার বিছানায় বোধহয় তোশকের ওপর একটা কম্বল পাতা আছে।

তাহলে একটু উঠুন। আমি কম্বলটা বের করছি।

লোকটা উঠল। ভারী কষ্ট হচ্ছিল। ঝিম মেরে খানিকক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। টলছে।

ওই চেয়ারটায় বসুন।

চান্দ্রেয়ী দ্রুত চাদর তুলে কম্বলটা বের করল। চাদরটা একটু ঝেড়ে পাতছিল, এমন সময় বিকট একটা শব্দে চমকে উঠল সে।

চেয়ার সমেত মেঝের ওপর পড়ে আছে লোকটা। উপুড়

হয়ে। চান্দ্রেয়ী কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে দেখল, লোকটার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, দাঁতে দাঁতে লাগা। জ্ঞান নেই।

রোগা হলেও চান্দ্রেয়ী দুর্বল নয়। আঁচলটা কোমরে বেঁধে সে দুহাতে লোকটাকে টেনে তুলল। শরীরটা বড্ড শক্ত হয়ে আছে। চান্দ্রেয়ী মেঝের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বিছানার কাছে আনল নচিকেতাকে। তুলতে পারল না, হাঁফাতে লাগল। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত, কিন্তু জ্বর এত বেশি যে সেটা দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়!

সরমা বা আলতাবুড়ি কেউই যে কেন আসছে না এখনও! এ লোকটাকে একা বিছানায় তুলে শোওয়ানো তার পক্ষে অসম্ভব।

চান্দ্রেয়ী দড়িতে টাঙানো গামছাটা টেনে এনে ভাল করে নচিকেতার গলা আর বুক ঢাকল। তারপর কুঁজো থেকে জল নিয়ে চোখে সাবধানে ঝাপটা দিল কয়েকবার।

লোকটা রক্তজবা চোখ মেলে অর্থহীন হয়ে চেয়ে রইল। তারপর উঠল। চান্দ্রেয়ী দেখল হাতের ব্যান্ডেজটা ভিজে নতুন করে রক্ত পড়ছে। এ লোকটা এভাবে থাকলে মরে যাবে।

শুয়ে গভীর গভীর শ্বাস টানল নচিকেতা। চোখ বোজা, মুখে অগাধ ক্লান্তির ছাপ। চান্দ্রেয়ী জ্বরটা দেখল। প্রবল। গা পুড়ে যাচ্ছে।

সরমা ঘরে ঢুকে বলল, আলতাবুড়ি নেই গো দিদিমণি। কোথায় গেছে। সারা পাড়া খুঁজে এলুম।

চান্দ্রেয়ী বিরক্ত মুখে বলল, কিন্তু এ লোকটার একটা ব্যবস্থা এক্ষুণি করা দরকার। না হলে বিপদ আছে।

কী করব বলো তো!

কাছাকাছি ডাক্তার নেই?

থাকলেই কি? দুপুরবেলা কাউকে পাওয়া যাবে না।

তাহলে অন্তত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে?

অবস্থা কি খারাপ?

ভীষণ জ্বর। ডিলিরিয়ামের মতো হচ্ছে।

দাঁড়ান। আমি তাহলে কাউকে ডাকি।

ঠিক এই সময়ে নচিকেতা মুখ ফিরিয়ে ডাকল, সরমা!

কী বলছেন?

কাউকে ডাকতে হবে না।

সরমা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চান্দ্রেয়ীর দিকে চাইল। চান্দ্রেয়ী এই জেদী, একগুঁয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটার দিকে রাগের চোখে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। শান্ত সরু গলায় বলল, এর চেয়ে আপনাকে পুলিশে অ্যারেস্ট করলেই ভাল ছিল। তারা হয়ত ডাক্তার দেখাত।

নচিকেতা ঘোর-লাগা অবস্থার মধ্যে চলে যেতে যেতেও যেন ফিরে এল চেতনায়। আবার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেওয়ার ব্যর্থ একটা চেষ্টা করে বলল, পুলিশ তো একদিন ধরবেই! আর কত পালিয়ে থাকব? এবার ধরবেই। দু'দুটো মার্ডার চার্জ।....শুনুন, পল্টুকাকাকে একটা খবর দেবেন?

ঠিকানা দিন।

বলবেন যেন আসে একবার।

চান্দ্রেয়ী তার ব্যাগ থেকে ছোট্ট নোটবই বের করে ঠিকানাটা টুকে নিল। তারপর বলল, আজই খবর দেব। হয়তো পল্টুকাকা পারবেন কিছু করতে।

কেউ শুনল না। নচিকেতা অগাধ ক্লান্তিতে অবচেতনায় তলিয়ে গেছে।

এই রহস্যময় লোকটি সম্পর্কে চান্দ্রেয়ীকে আর একটু জানতে হবে। তার শীতল, নির্বিকার মানসিকতায় এই বোধহয় প্রথম একটা বিস্ময়বোধ ধাক্কা দিচ্ছে। সে ঠিক এরকম আর কাউকে দেখেনি। লোকটা জীবন-মৃত্যুর সীমানায় সরু সুতোর ওপর হাঁটছে। এর আছে একটা উজ্জ্বল অতীত, আর ম্লান বর্তমান।

দুটোয় কিছুতেই মিলছে না। বড্ড গোলমেলে অঙ্ক।

অগ্রহায়ণের সামান্য তপ্ত দুপুরের রোদ গায়ে মেখে চান্দ্রেয়ী উত্তর কলকাতার ঠাণ্ডা প্রাচীন গলিতে ঢুকল। অচেনা পাড়া, তাই পদক্ষেপ দ্বিধাগ্রস্ত। তবে পল্টুর বস্তিবাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হলো না।

দরজা খুলে দশাসই মানুষটি বেরিয়ে এলেন।

আমাকে খুঁজছেন? কেন বলুন তো!

নচুবাবু খুব অসুস্থ। আপনাকে একবার যেতে হবে। আজই।

পল্টু দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, ভিতরে আসুন।

ভিতরে ঢুকে চান্দ্রেয়ী দেখল, বস্তিবাড়ি হলেও এদের অবস্থা খারাপ নয়। বসবার ঘর যেমন হয় তেমনই মোটামুটি সাজানো। একটা টি ভি সেটও আছে।

বসুন। কী হয়েছে বলুন তো?

উনি উণ্ডেড। কাল একটা গুণ্ডার দল এসেছিল।

গুণ্ডার দল! একটু ডিটেলসে বলুন।

চান্দ্রেয়ী বলল, পল্টু গম্ভীর মুখ করে শুনে গেলেন। চোখ বোজা। চান্দ্রেয়ী লক্ষ্য করল, চোখের কোলে একটু টলমলে অশ্রু। কাঁদবার তো কথা নয়। তবে দশাসই লোকটা কাঁদছে কেন?

চান্দ্রেয়ীর কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও লোকটা অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইল যেন। মুখে কথা নেই, শুধু ঢোঁক গেলার জন্য ঘন ঘন কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে।

মন্মথনাথ! তিনি ছাড়া আর কে!

চান্দ্রেয়ী ভারী অবাক হলো। মন্মথনাথ আবার কে?

পল্টু তার দিকে চেয়ে ধরা গলায় বললেন, মন্মথনাথ আবার ফিরে এলেন তাহলে! এ বিদ্যে তো যার তার নয়।

আপনি কার কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

ওর দাদু।

পল্টু উঠে বললেন, আমি ওর ব্যবস্থা করছি।

চান্দ্রেয়ী কুণ্ঠিতভাবে বলল, উনি হয়তো ডিলিরিয়ামের ঝোঁকে কিছু ভুল বকছেন। কিন্তু সেগুলো আপনার জানা দরকার। ওঁর নামে নাকি মার্ডার চার্জ আছে!

প্লীজ! কাউকে কথাটা বলবেন না।

সত্যিই আছে?

আছে।

আমি কাউকে বলব না। তবে এভাবে পালিয়ে তো বেশিদিন থাকা যাবে না।

উপায় কী?

সুজিৎ নামে একজনের কথাও উনি বলছিলেন। তাকে উনি ভয় পান।

পাওয়ারই কথা। আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। বাকিটা আমি সামলে নেব।

চান্দ্রেয়ী উঠল। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল। তার কপালে কুঞ্চন। মাথায় অনেক প্রশ্ন। পল্টু লোকটাকে তার ভালও লাগল না মন্দও লাগল না। সে আসলে বুঝতেই পারল না লোকটা কেমন।

চান্দ্রেয়ী গলির মুখে তিনটে ছেলেকে পেয়ে গেল। আড্ডা মারছে।

আচ্ছা, এখানে সুজিৎ বলে কেউ থাকে?

সুজিৎ! কোন সুজিৎ?

পদবী তো জানি না। তবে পার্টি করত।

ওঃ, সুজিৎ! বান্টুর দাদা। কিন্তু সে তো হাপিস হয়ে গেছে।

তার মানে?

মানে এখানে নেই।

তার সঙ্গে দেখা করা যাবে না, না?

পুলিশের হুড়োটুড়ো খেয়ে যে তো গাড্ডায় পড়ে গিয়েছিল। শুনছি নাগেরবাজার না কোথায় যেন লরির বিজনেস করে।

মালদার লোক। পার্টি-টার্টি করে না এখন।

ঠিক জানেন?

খুব জানি।

আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব? নচিকেতা মিত্র বলে কেউ কি থাকতেন এখানে?

নচিকেতা! আরে সে তো মন্মথ মিত্তিরের নাতি! থাকত। ওই তো বাড়ি। পল্টু মস্তান বাড়ি হাতিয়ে নিয়েছে।

তার মানে?

সে অনেক ব্যাপার মিস, জানতে চাইছেন কেন?

আমি নচিকেতা সম্পর্কে একটু জানতে চাই।

আপনি কি পুলিশের লোক নাকি? আজকাল তো পুলিশেও মেয়েছেলে রিক্রুট করছে বলে শুনি।

না, আমি পুলিশের লোক নই। আমি জানতে চাই, নচিকেতা কাকে মার্ডার করেছিল!

মার্ডার!! তিনটে ছেলে একসঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর পরস্পরের দিকে চেয়ে বড় বড় চোখে ফের চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, মার্ডার করেছে কে বলল?

অনেকে বলে। কোন ক্লাবে যেন দুটো ছেলেকে খুব মেরেছিল। একজন মারা যায়।

পয়লা ছেলেটা সবিস্ময়ে বলে উঠল, সে তো জানি। চিন্টুকে মেরেছিল খুব। কিন্তু সে শালা তো মরেনি মিস।

মরেনি?

না।

আর কাউকে?

সুজিৎ একটা ছেলেকে মেরেছিল গুলির মধ্যে। পুলিশ প্রথমে নচিকেতাকে খুঁজেছিল। পরে সুজিৎকে অ্যারেস্ট করে।

নচিকেতার নামে কোনও মার্ডার চার্জ নেই? ঠিক জানেন?

আমরা পাড়ার সব খবর রাখি মিস। বেকার তো। ওটাই পাসটাইম।

চান্দ্রেয়ী তবু নিশ্চিন্ত হলো না। সে থানায় গেল।

থানা থেকে চট করে খবর বের করা বড় সহজ নয়। ব্যাপারটা একদিনেও হলো না।

তবে চান্দ্রেয়ী নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে রইল। তিন-চার দিন বাদে বড়বাবু বললেন, কোথাও নচিকেতা মিত্রের নামে তো কোনও কেস পাচ্ছি না।

অন্য কোন থানায় বা লালবাজারে নেই তো!

তা সম্ভব নয়। এই এলাকায় ক্রাইম হয়ে থাকলে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট এখানেই হবে।

তাহলে কি নচিকেতা মিত্র অ্যাকিউজড নয়?

না। চিটিং কেস-এরও কোনও রেকর্ড নেই।

চান্দ্রেয়ী চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসে রইল। চিন্তিত, কিন্তু ভারাক্রান্ত নয়।

গত তিন-চার দিন সে লেক গার্ডেনসের বস্তিতে যায়নি। থানা থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণের বাস ধরল।

সরমা পাঠশালায় পড়াচ্ছিল। চান্দ্রেয়ীকে দেখে উঠে এসে বলল, কী খবর দিদিমণি? নচুবাবুকে হাসপাতালে নিতে হয়ছে, জানো তো! সেই পল্টুকাকা এসে সেদিনই নিয়ে গেছে। কিছুতেই যাবে না। জবরদস্তি নিতে হলো।

এখন কেমন আছে উনি?

সে খবর কে জানবে বলো?

কোন হাসপাতালে আছেন?

সরমা মাথা নেড়ে বলল, তাও কেউ জানে না।

তার মানে?

পল্টুকাকা নিয়ে গেছেন, তিনিই জানেন। ছেলেরা কাছেপিঠের হাসপাতালে সব ঘুরে এসেছে। কোথাও নেই।

তাহলে কি উত্তর কলকাতায়?

কে জানে!

হঠাৎ ধক করে বুকটায় কেমন লাগল চান্দ্রেয়ীর। পল্টুকাকা!

মার্ডার চার্জ। ফেরার হওয়া। নচিকেতার সব রকম ঘটনার মধ্যেই একমাত্র সুতোর কাজ করেছেন পল্টুকাকা!

শোনো সরমা, তোমরা কলকাতার সব হাসপাতালে একটু খোঁজ নাও। ভদ্রলোকের খবর পাওয়াটা জরুরী।

সবাই সেকথাই বলছে। কিন্তু পল্টুকাকাও আর এর মধ্যে আসেননি যে!

আমি পল্টুকাকার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। তাঁর কাছে লোক পাঠাও।

তাহলে সেটাই তো ভাল। হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে মরার চেয়ে পল্টুকাকাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়!

উনি যদি বলতে না চান!

চাইবে না কেন?

কারণ কিছু থাকতেও পারে। আমি কাল ফের আসব।

৫

এ ঘরখানা চারতলা বা তারও বেশি উঁচুতে। বোধহয় চিলেকোঠা। ছোট্ট ঘরখানায় সে একা। এখন দুপুর। একটু আগে তার সম্বিত ফিরেছে। একটা দীর্ঘ ঘুমের পর যেমন হয়, তেমনই এক আলস্য জড়ানো জাগরণ। শরীরে এখনও তীব্র ব্যথা। জানালা দিয়ে সে কলকাতার পুরোনো বাড়ির ছাদ দেখতে পাচ্ছিল। কোথায় সে? এ তো হাসপাতাল নয়!

নচিকেতা উঠল। জানালার কাছে গিয়ে একটু চেয়ে থেকেই সে বুঝতে পারল, এটা বউবাজারের কাছাকাছি অঞ্চল। এ কি সেই হোটেলটা যেখানে সে ফেরারী জীবন শুরু করেছিল? তাই হবে।

আবছা ঘোরের মতো স্মৃতি নাড়া খেল। যতদূর মনে পড়ে, তাকে তুলে এনেছিল পল্টুকাকা। সভ্য সমাজের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র পল্টুকাকা। তাঁকেই এখন দরকার নচিকেতার। কী করবে সে এখন? কিভাবে বেঁচে থাকবে।

শরীর অসম্ভব দুর্বল। পা কাঁপছে। মাথা টলছে। হাত ঝিনঝিন করছে দুর্বলতায়।

দরজা খুলতে গিয়ে সে অবাক হলো। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবল নচিকেতা। বন্ধ কেন? হয়তো অতিরিক্ত সাবধানতা নেওয়া হচ্ছে। এটা হোটেল। যে-কেউ এসে ঢুকে পড়তে পারে।

ঘরে টেবিলের ওপর কয়েকটা ওষুধের স্ট্রিপ পড়ে আছে। একটা ইনজেকশনের ভায়াল। ঘুমের ওষুধ। চারদিকটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ ভারী চমকে গেল নচিকেতা। ঘরের কোণে একটা লম্বা লাঠি দাঁড় করানো।

পাকা বাঁশের তেল চুকচুকে লাঠি।

লাঠিটা এখানে কেন? কে রেখে গেল?

নচিকেতা ভূত দেখলেও এত ভয় পেত না, যতটা লাঠি দেখে পেল। লাঠিকে সে আর বিশ্বাস করে না।

সভয়ে নচিকেতা আবার শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল। কিন্তু তার দুর্বল শরীরে মাথা ভাল কাজও করছে না। সে কোনও ঘটনার সঙ্গে কোনও ঘটনা মেলাতে পারছে না।

অনেক চিন্তার মধ্যে হঠাৎ ঝক করে একটা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। ভারী চমৎকার একটি মুখ। তবে মুখের রেখাগুলো কঠিন, চোখের দৃষ্টিতে একটা মৃত ভাব। চান্দ্রেয়ী না নাম মেয়েটির? জ্বরের ঘোরে শুনেছিল। এখন ভাল মনে নেই।

অনেক—অনেকক্ষণ মেয়েটির মুখ তার চোখের সামনে ভেসে রইল।

তারপর চোখ বুজল নচিকেতা। ফের চোখ খুলতেই নজর পড়ল লাঠিগাছের ওপর। লাঠি! তার ঘরে লাঠি কেন?

দুপুর কেটে আস্তে আস্তে বেলা মরে বিকেলের রং লাগল রোদে। নচিকেতা অপেক্ষা করছে। কিসের অপেক্ষা তা সে জানে না।

ছাদে কি কেউ এল? একটা পায়ের শব্দ যেন! নচিকেতা নিঃশব্দে উঠে দরজার কাছে এসে কান পাতল। হ্যাঁ। ছাদে কেউ এসেছে। গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি ভেসে আসছে বন্ধ ঘরে।

নচিকেতা দরজায় সাধ্যমতো জোরে শব্দ তুলে ডাকল, শুনছেন! শুনতে পাচ্ছেন।

গান থেমে গেল। পায়ের শব্দ এগিয়ে এল কাছে।

কাইণ্ডলি দরজাটা একটু খুলে দেবেন?

বাইরে থেকে একজন পুরুষের গলা বলে উঠল, ভিতরে কে?

আমি একজন গেস্ট। কে যেন রসিকতা করে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে গেছে। একটু খুলে দেবেন?

ভারী বদ রসিকতা। কিন্তু দরজায় যে তালা ঝুলছে!

ম্যানেজারকে একটু খবর দেবেন, প্লীজ?

দাঁড়ান, এখানে পেরেকে ঝোলানো একটা চাবি রয়েছে দেখছি।

তাহলে ওটাই হবে।

খুললে কোনও বিপদ হবে না তো মশাই?

না। আমি খারাপ লোক নই।

দেখবেন।

দরজা খুলে গেল। বাইরে একজন মাঝবয়সী লোক। চোখে ভয়।

ধন্যবাদ। নচিকেতা বলল।

আপনাকে তো বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, হাতে ব্যাণ্ডেজ!

হ্যাঁ। আমি খুব অসুস্থ ছিলাম।

অসুস্থ লোকের সঙ্গে কেউ তো রসিকতা করে না। আপনাকে তালা দিল কেন?

নচিকেতা মৃদু হেসে বলল, আমি আসলে পাগল। ভায়োলেন্ট টাইপ।

লোকটা ফ্যাকাশে হয়ে বলল, মানে!

মারধর করি, কামড়ে-টামড়ে দিই।

লোকটা পিছিয়ে একেবারে সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে গেল।

নচিকেতা ঘরটা একবার দেখে নিল। নেওয়ার মতো কিছু আছে কি? আছে। একটা নাইলনের ছোট ব্যাগ। তাতে তার কিছু জামাপ্যান্ট। সামান্য কিছু টাকাও রয়েছে। একটা বই।

নচিকেতা দুর্বল শরীরে পোশাক পরল। তার জ্বর আর নেই। জ্বর নেই বলে সে মনের একটা জোর অনুভব করছে। পোশাক পরতে হাঁফ ধরে গেল বলে সে বসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠল।

যেতে হবে। দীর্ঘকালের ফেরার জীবনের একটা চূড়ান্ত ইতি টানা দরকার। কী করবে পুলিশ আইন-আদালত? ফাঁসি দেবে? দিক। এর চেয়ে সেটা অনেক সহনীয় হবে। জ্বরের পর সে আজ এই সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল অনায়াসে।

পল্টুকাকা তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঁচা তো এটা নয়। যতদিন আয়ু থাকবে ততদিন মৃত্যুর পদধ্বনি রোজ শুনবে সে। তার চেয়ে যা হওয়ার হোক।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামল নচিকেতা। অনেক সিঁড়ি। শেষ হতে চাইছে না। তবে কপাল ভাল, কারও সঙ্গে দেখা হলো না তার। বাইরে এসে সে একটা ট্যাক্সি নিল। সোজা থানায়।

সোজা থানায় ঢুকে পুলিশের পোশাক-পরা যাকে প্রথম সামনে পেল তার দিকেই দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমাকে অ্যারেস্ট করুন, আমার নামে আপনাদের হুলিয়া আছে।

এ কথায় সামান্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। লোকটা পাগল না মাতাল এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত সবাই। অবশেষে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো বড়বাবুর সামনে।

বড়বাবু ধৈর্য ধরে শুনে বললেন, আপনি অ্যাবসকণ্ডার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নচিকেতা মিত্র সম্পর্কে এর আগেও একজন খোঁজ করতে এসেছিল। একটি মেয়ে। আমরা রেকর্ড দেখেছি। আপনারা নামে কোনও কেস নেই।

তার মানে?

মানে বলা সহজ নয়। আপনাকে কেউ চিট করেছে। আপনি কোথায় থাকেন?

নচিকেতা তার ঠিকানা বলল।

কার বাড়ি বলুন তো!

মন্মথ মিত্রের বাড়ি।

মাই গড! লাঠিয়াল মন্মথ নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি তাঁর কে হন? নাতি?

হ্যাঁ।

ভগবান! মন্মথনাথের নাতির এই দশা! কী হয়েছিল বলুন তো?

আপনি আমার দাদুকে চিনতেন?

চিনতাম বললে কম বলা হবে। আমার বাবা তাঁর কাছে তালিম নিতেন। বাবা এখনও বেঁচে। এবার ঘটনাটা বলুন।

নচিকেতার বেশি কথা বলার মতো অবস্থা নয়। ঠেকে ঠেকে, দম নিয়ে নিয়ে, কষ্ট করে বলল। সময় লাগল অনেকটা।

বড়বাবু নিবিষ্টভাবে শুনলেন। তারপর বললেন, অনেক আগেই আপনার আমাদের কাছে আসা উচিত ছিল। মনে হচ্ছে আপনার বিষয়-সম্পত্তির জন্যই গল্পটা সাজানো হয়েছে। কোথায় থাকেন আপনি?

লেকগার্ডেনসের এক বস্তিতে। পল্টুকাকাই ঠিক করে দিয়েছিলেন।

বড়বা উঠে পড়লেন। বললেন, চলুন। আপনার নিজের বাড়িটা একবার দেখা দরকার।

বাড়ির সামনে এসে ভারী অবাক হয়ে গেল নচিকেতা। কোথায় বাড়ি? চাতলা ঝকঝকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ফটকে দারোয়ান।

এইটে কি?

মনে হচ্ছে ও জায়গাতেই। কিন্তু এটা সে-বাড়ি নয়।

ঠিক যে?

ঠিক। পাশের ব্যায়ামাগারটা যে আমি চিনি। আমার দাদু এটা তৈরী করিয়েছিলেন।

বড়বাবু একটু চিন্তিতভাবে নচিকেতার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, বড্ড ভুল করে ফেলেছেন। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। বাড়ির মালিকানা কবুল করতে গেলে অনেক জলঘোলা হবে। কয়েকদিন থাকবার মতো ডেরা আছে কোথায়ও? কোনও বন্ধুর বাড়ি-টাড়ি?

নচিকেতা একটু হাসল। বস্তিতে আমার ঘরখানা তো এখনও আছে।

সেখানেই থাকতে চান?

বড়বাবু ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। আপনাকে সেখানেই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

তারপর কী হবে?

কয়েকজনকে বোধ হয় অ্যারেস্ট করতে হবে। উপায় নেই।

সভয়ে নচিকেতা বলল, কাকে?

দেখা যাক। বোধহয় আপনার খুব কাছের লোকদেরই।

লেক গার্ডেনসে ফিরে আসার দীর্ঘ পথটা নচিকেতা শুধু ভাবল আর ভাবল। ভেবে কোনও কূল পেল না। এর মানে কী? সে তাহলে খুন করেনি? তার নামে কোনও কেসই নেই? তাহলে পল্টুকাকা—?

নানা সমস্যা ও শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নচিকেতা। কিন্তু স্বপ্ন দেখল ভিন্নরকম। স্বপ্ন দেখল নানারকম। তবে একটা ভাঙা স্বপ্নের একটুখানি টুকরোয় একটা আবছা চেনা মুখ ছিল।

পরদিন একটু বেলায় সেই চেনা মুখ রূপ ধরে এল।

আপনি ফিরেছেন! কোথায় ছিলেন?

নচিকেতা মৃদু হাসল। জবাব দিল না।

জ্বর সেরেছে?

একদম নেই।

ডাক্তার দেখালেন শেষ অবধি?

নচিকেতা আবার হেসে এড়িয়ে গেল।

চান্দ্রেয়ী চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, শুনুন, আপনার পটুকাকা—আন্দাজ করছি।

আপনি তাহলে—?

খুনী নই। আপনি খোঁজ নিয়েছিলেন বলে ধন্যবাদ।

বাড়িতে ফিরবেন তো এবার?

আমার বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।

তার মানে?

বাড়ির জন্যই বোধহয় এতসব হলো। সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে।

তাহলে থাকবেন কোথায়?

এ জায়গাটা কি ততটা খারাপ? আমার তো বেশ লাগে।

চান্দ্রেয়ী মৃদু একটু হাসল, আপনি খুব অদ্ভুত।

নচিকেতা মৃদু মৃদু হাসছিল। হঠাৎ ভারী লাজুক গলায় বলল, আপনিও।

দুজনে একসঙ্গে হাসল। সেই হাসিতে দুজনের ভিতরেই অলক্ষ্যে কিছু ভাঙচুর হয়ে গেল। তারা সচেতনভাবে তা টের পেল না। কিন্তু দুজনেই দুজনের দিকে অপলক কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল। আবার তাকাল। আবার চোখ সরিয়ে নিল।

দুজনের মধ্যে অদৃশ্য এক তন্তুবায় জাল বুনে চলল।

NSB